পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

অমল হোম

কলিকাতা
২২শে শ্রাবণ। ১৩৬২ ॥

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

বাইশে শ্রাবণ

॥ ১৩৬২ ॥

সূচী

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

১৩৬২। ২৭শে বৈশাখ মহাজাতিসদনে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিখন

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

অদ্যকার এই উৎসবের যে কর্ম্মসূচী আজ সকালে খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তাতে আমার এখানকার বক্তব্য বিষয়বস্তুকে একটু সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আমি একটু পরেই যে "মায়ার খেলা" অভিনয়ের আয়োজন আপনারা করেছেন, সেই বিষয়েই আলোচনা করব। এই অনুষ্ঠানে আমার করণীয়কে এইভাবে সীমিত করবার অভিপ্রায় আমার নেই। "মায়ার খেলা" প্রসঙ্গে কিছু বলবার পূর্ব্বে আমি রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলবার অনুমতি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি।

প্রথমেই এই সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তিন বৎসর আগে তাঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ ঘটেছিল। 'রবীন্দ্রনাথ মাধুর্য্যের কবি, বীর্য্যের কবি নন,' তাঁদের প্রচারিত এই মতটিকে আমি "যুগান্তর" পত্রিকায় খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলাম। সে-প্রসঙ্গে আমার আলোচনা তীব্রই ছিল। শুনেছি, দুর্ম্মুখ বলে কোন কোন মহলে আমার খ্যাতি আছে; কিন্তু সে-বাদানুবাদের কথা ভুলে তাঁরা আজ আমাকে এখানে ডেকেছেন। তাঁদের এ-দাক্ষিণ্যে সে-বিরোধের কাঁটাটি উৎপাটিত হোল। আমি আনন্দিত।

ইতিপূর্ব্বে কোন বৃহৎ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করিনি। দু'চারটি ঘরোয়া উৎসবে অবশ্য কখনো কখনো কিছু বলেছি। কিন্তু সে নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। আজ আপনাদের এই ব্যাপক, বৃহৎ জনবহুল অনুষ্ঠানে একথাটা কেন উল্লেখ করছি, তার কারণ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত হ'লেও—এখানে না বলে পারছি না। কবির দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলাম যে, অন্ততঃ পাঁচ বছর না গেলে তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্য কোন সমাবেশে কিছু বলব না। মনে এই কথাটিই ছিল—"ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে প্রচার করি হে।"

তারপর আরও ন'বছর কেটে গেছে। এই ন'বছরে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে দিকে দিকে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে—হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ-সব অনুষ্ঠান যেভাবে পরিচালিত হয়, তাতে আমি অন্তরের দিক থেকে একান্তভাবেই বাধা অনুভব করি। কেননা, এ-সব উৎসবে শুধু নৃত্য, গীত আর অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর যে-পরিচয় ফুটে ওঠে; তাঁর যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়; তাতে তাঁর পরিপূর্ণ রূপের অভিব্যক্তির, তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক উপলব্ধির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলেই আমি মনে করি। তাই এই ধরণের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদানে আমার মন সায় দেয় না। আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না,—আমি না বলে পারছি না যে, এইভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ রবীন্দ্র-বারোয়ারীতে পরিণত হতে চলেছে। তাতে এসে লেগেছে সরস্বতী-পুজোর হৈ-হুল্লোড় হুজুগের ঢেউ। লঘুতা, চপলতা, বাচালতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বেশি জায়গাতেই তার বিশিষ্ট লক্ষণ। তিন বছর আগে আমি "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম যে-ভাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। আমার সে সুদীর্ঘ পত্র "যুগান্তর"-এ ছাপা হয়েছিল, কিন্তু আমার মতামত কোন সম্পাদকীয় সমর্থন পায়নি। এতদিন পরে পেয়েছে। এবার ২৫শে বৈশাখের প্রভাতে "যুগান্তর" সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমতে সুদৃঢ় সতর্কবাণী প্রচার করেছেন। আমি সেই সম্পাদকীয় থেকে একটু পড়ে শোনাতে চাই আপনাদের—

> "পাড়ায় পাড়ায় তাঁহার নামে সভা-সমিতি ও উৎসব হইতেছে, ঘরে ঘরে তাঁহাকে ধূপ দীপ ও ফুল-পল্লবে পূজা করা হইতেছে, কিন্তু এই বহু-ব্যাপ্ত রবীন্দ্র-পূজার মধ্যে আড়ম্বরের অংশ যতটা, উপলব্ধি ও অনুধাবনের অংশ ততটা নয়। তা' নয় বলিয়াই কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে, নিবন্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পরিব্যাপ্ত যে রবীন্দ্র-সাহিত্য, তাহার দিকে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা শুধু গান ও নৃত্য-নাট্যকেই রবীন্দ্র-পরিচিতির শ্রেষ্ঠতম উপকরণ করিয়া তুলিয়াছি। ......এত বড় মহানেতা খুব কম জাতির ভাগ্যেই জন্মায়—সেদিক হইতে আমাদের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না, কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারকে আমরা যদি শুধু নাচিয়া-কুঁদিয়া ব্যর্থ হইতে দিই তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কাছে একদিন আমাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।"

এই সুচিন্তিত, নির্ভীক মতপ্রকাশে "যুগান্তর" যথাযোগ্য কর্তব্যই করেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-জন্ম-পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচার-প্রচেষ্টায়, বিশ্বভারতীর সহায়তায়, "যুগান্তর"-কর্তৃপক্ষ যে সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বন করেছেন, আপনাদের তরফ থেকে, তার জন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

বৎসর বৎসর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব এখন যেভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপালিত হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে নিখিল-বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ, আপনারাও যে সচেতন, তা' সাংবাদিক বৈঠকে আপনাদের মুদ্রিত বিবৃতিতেই সুস্পষ্ট। আপনাদের যুগ্ম-সম্পাদক* বলছেন—

"রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চারদিকে এত যে উদ্দীপনা, আমাদের সন্দেহ হ'চ্ছে তার মূলে রবীন্দ্র-ভক্তির চাইতে হুজুগপ্রিয়তাই কাজ করছে; কোন সুস্পষ্ট আদর্শ এবং লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে না।

একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু কেন রবীন্দ্র-ভক্তির চাইতে হুজুগ-প্রিয়তাই কাজ করছে? কেন এ-সব উৎসব এমন হৈ-হুল্লোড়ে পরিণত হচ্ছে? কেন এসব উৎসব শুধু নাচ-গান আর অভিনয়েই পর্য্যবসিত? কেন কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ এবং লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে না, এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমাকে দিতে বলেন, তবে আমি বলব —রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে উৎসব-কর্ত্তাদের সম্যক পরিচয়, এমন কি কোন কোন স্থানে আংশিক পরিচয়ও নেই বলেই। আমি এ-ক্ষেত্রে অধিকারীভেদ মানি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-পালনে সকলেরই, সব প্রতিষ্ঠানেরই অধিকার আছে, এ-কথা আমি স্বীকার করি না। কেন করি না, সে-কথাটা একটু খুলেই বলি। বছর-পাঁচেক আগে, বৈশাখের কোন এক সকালে একখানি মস্ত মোটরগাড়ী আমার বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তা' থেকে তিনটি ভূলুণ্ঠিত-বসনপ্রান্ত, সুবেশ তরুণ নেমে এসে উঠলেন আমার বৈঠকখানায়। সমাদরপর্ব শেষ ক'রে প্রশ্ন-পর্বে এসে জানা গেল, তাঁরা এসেছেন দক্ষিণপাড়ার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

* শ্রীসুহৃৎ রুদ্র ও শ্রীপরিমল চন্দ্র।

উৎসবে আমাকে সভাপতি-পদগ্রহণে আমন্ত্রণ জানাতে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম "Three Cards Club"—মুখ্যতঃ সেটা তাসের আড্ডা, তা'ছাড়া সেখানে ইনডোর গেমস্-এরও কিছু ব্যবস্থা আছে। দুষ্টা সরস্বতী সহসা আমার কণ্ঠে আসন গ্রহণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম,—"আচ্ছা, আপনারা 'তাসের দেশ' পড়েছেন?" উত্তরে শুনলাম—"না স্যর। কার লেখা বলুন তো?" তখন আমি হেসে জানালাম—"আস্‌ছে বছর 'তাসের দেশ'টা পড়ে আপনারা আমার কাছে আসবেন, আমি আপনাদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করব। এবার আমায় ক্ষমা করুন।" তখন তাঁরা আমায় ধ'রে বসলেন,—"স্যর, আপনি না যেতে পারেন, সজনীবাবুকে যাবার জন্যে সুপারিশ করে একটা চিঠি দিন আমাদের। আমরা তাঁর কাছে যাব। তাঁকে তো আপনি খুব ভাল করেই জানেন। গেল বছর আমাদের একটা রাইভ্যাল ক্লাব তারাশংকরবাবুকে নিয়ে গেছল—এবার যদি সজনীবাবুকে অন্ততঃ না নিয়ে যেতে পারি, আমাদের আর মান থাকবে না স্যর।"

এই মনোভাব নিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এক পাতাও পড়েননি, তাঁরাও আজ পাড়ায় পাড়ায় কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছেন রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে! আপনারা নিশ্চয় বলবেন না যে, এঁদের কোন অধিকার আছে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-পালনে,—বহু আড়ম্বরের বিপুল দীনতায় তাঁর পরিপূর্ণ মূর্তিটিকে আচ্ছন্ন করে দিতে? অবশ্য পাড়ার মা-সরস্বতীর বরপুত্র বখাটেদের তাঁর পুজোর আয়োজনের অধিকার যদি স্বীকার করেন, তবে অবশ্য রবীন্দ্র-নিরক্ষর এই সব অর্বাচীনদের অধিকারও মানতে হবে!

এই প্রসঙ্গে আমি কলিকাতা-প্রবাসী তামিল-বন্ধুদের অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের উল্লেখ না করে পারছি না। এবার ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় তাঁদের মহান কবি ভারতী-র নাম-সংযুক্ত তামিল-সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার সুযোগ আমি লাভ করেছিলাম। তাঁদের সে-সঙ্ঘের ছোট একটি ঘরে, বড় জোর একশো তামিলনাদবাসীদের শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে যে-অনুষ্ঠানটি সেদিন সেখানে সম্পন্ন হোল, তার ঐকান্তিকতার ও যে গুটিকয়েক অভিভাষণ সেখানে শুনলাম, তাতে রবীন্দ্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুভূতির গভীরতার যে পরিচয় পেলাম,

তা' আপনাদের বুঝিয়ে ব'লতে পারব না। শুধু এইটুকু জানাই যে, সেখানে একটি তামিল মহিলার সুললিতকণ্ঠে সুর-তাল-লয় ও ভাব-সমন্বিত যে অপূর্ব্ব রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনলাম, তা' উচ্চারণ-ভঙ্গীর অতি সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও কলকাতার বহু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জল্‌সায় শুনবার আশা রাখি না। আর উচ্চারণের কথা ধরলে, ক'জন বাঙালী মেয়ের হিন্দী-গানের উচ্চারণই বা শ্রবণযোগ্য?

কিন্তু অন্যত্র কি দেখছি? বলতে লজ্জা হয়, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে লেগেছে বারোয়ারীর কোঁদল; সংক্রামিত হয়েছে অসুষ্ঠু আচরণ। একই পল্লীর উৎসব দু-টুকুরো হয়ে বস্‌ছে দু'জায়গায়। প্রাচীরপত্রে ছেয়ে যাচ্ছে চৌরাস্তা, অলিগলি,—সিনেমার অমুক অভিনেতা-অভিনেত্রী 'অংশ গ্রহণ' (খবরের কাগজের তৈরী অপভাষা!) করবেন। এই অশোভন আকর্ষণ-সৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে হবে আপনাদের। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সিনেমার নট-নটীদের যোগদানে, তাঁদের আবৃত্তি, অভিনয় বা সঙ্গীত-নিবেদনে আমার কোনও আপত্তি নেই;—সে বিষয়ে রুচি-বায়ু বা শুচি-বায়ু কিছুই নেই আমার। আমার আপত্তি, আমার প্রতিবাদ, —যে-মনোভাব, যে-দৃষ্টিভঙ্গী এই আসর-জমানোর, আসর-জম্‌কানোর পিছনে রয়েছে তারই বিরুদ্ধে। এখন থেকেই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব যেন শেষ পর্য্যন্ত ইডেন গার্ডেনস্‌-এর ক্রিকেট ফেস্‌টিভ্যালে পরিণত না হয়। বুঝি এবার তারই আয়োজন শুরু হোল। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!

কিন্তু শুধু প্রতিবাদ করলেই হবে না; এর প্রতিকার করতে হবে। সে প্রতিকারের পথ কি? তার একমাত্র উপায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির সম্যক আলোচনা—তার সঙ্গে আত্মিক যোগ-স্থাপন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে শুনে আশ্বস্ত হয়েছি, আপনাদের সম্পাদক-যুগল জানিয়েছেন যে, "আমরা এই বার্ষিক সম্মেলনের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব না।" প্রতি তিন মাস অন্তর রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার বন্দোবস্ত করবেন বলে আপনারা ঠিক করেছেন। এই হোল সত্যিকার কাজ। নিমতলাঘাটে যেখানে তাঁর শেষকৃত্য হয়েছিল, পৌরকর্ত্তাদের অবহেলায়, রবীন্দ্র-ভারতীর জড়তায় ও আমাদের ঔদাসীন্যে যদি সে-স্থান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়, তবে তা'

আমাদের লজ্জার কারণ হলেও ক্ষতির কারণ হবে না—যদি ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা সত্যই আপনারা করতে পারেন। আর, নিমতলা শ্মশানের সেই পুণ্যস্থান আবার গোচারণ-ভূমিতে পরিণত হবার পূর্বেই, প্রার্থনা করি, যেন সুরধুনী গঙ্গা তাকে গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করণীয় আমাদের আছে—মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়কে, তাঁর পরিপূর্ণ মানব-মূর্তিটিকে সর্বজনগোচর করে তোলা। মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির চেয়ে এতটুকুও ছোট ছিলেন না। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—এই কথাটা বুঝবার, বলবার ও বোঝাবার সময় এসেছে। তিনি যে মানুষ হিসাবেও কত বড় ছিলেন, কেমন সর্বাঙ্গীণ মানুষ ছিলেন, তা' জানলে, বুঝলে, শুধু যে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হবে তা' নয়—আমরা উপকৃত হব, আমাদের কল্যাণ হবে। তাঁর মানবিক সত্তার পরিচয়, তাঁর বীর্য্যবান মনুষ্যত্বের পরিচয় নানা দিক থেকে যাঁরা দিতে পারেন, তাঁর কাছে আসবার, তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল—সে-সম্পর্কে তাঁদের যে কর্তব্য রয়েছে তা' পালন করবার জন্য আমি আজ এই অবকাশে তাঁদের কাছে, আপনাদের ও আমার নিজের তরফ থেকে, অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের সৌভাগ্য, পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমার বাল্যবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, তাঁর পত্নী শ্রীমতী রাণী মহলানবীশ, দীর্ঘকাল কবির একান্ত-সচিব অমিয় চক্রবর্তী, তাঁর পরবর্তী অনিলকুমার চন্দ—বলতে গেলে তাঁরা কিছুই দেননি তাঁর সে পরিচয়। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও সামান্যই দিয়েছেন—আংশিকভাবে। বন্ধুবর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-তথ্যের অকৃত্রিম আকর, সুবৃহৎ ও এখনও অসম্পূর্ণ তিন খণ্ড রবীন্দ্র-জীবনীতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বেশ কিছু দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর সে-মূর্ত্তিটি সংহত রূপ নেয়নি। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য়, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর "নির্বাণ"-এ, শ্রীমতী রাণী চন্দের "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"-এ, শ্রীমতী সীতা

দেবীর "পুণ্য স্মৃতি"তে, প্রমথনাথ বিশির "শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ"-এ, শচীন্দ্র অধিকারীর "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ"-এ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অনেক পরিচয়। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" বইখানিতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের যে সমুজ্জ্বল রূপটি ফুটেছে, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে তা দীপ্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু কোন কিছুতেই সম্পূর্ণ পাই না সেই রবীন্দ্রনাথকে,—যাঁকে চন্দ্রনাথ বসু-মশায় কবিরই কাছে লেখা এক চিঠিতে "পুরুষপ্রধান" বলে সম্বোধন করেছিলেন।* সেই পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেবার ও নেবার সময় এসেছে,—সেই রবীন্দ্রনাথের। সে-মানব অতি-মানব নয়, প্রাকৃত-চিত্তহারী অলৌকিক-কর্ম্মা পুরুষ নয়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সকাতর বৈরাগী নয়—এই ধরণীর ধূলোট-উৎসবে ধূলিলিপ্ত-বাস মানুষের-পাশে-দাঁড়ানো মানুষ রবীন্দ্রনাথ,—দুঃখে-শোকে অবিচলিত, কর্ত্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠ, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ, প্রেমে দীপ্ত,—পরিপূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথ।

সংসারে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুঃখ-শোক খুব বেশী লোক পায়নি। মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে চারটি শিশুসন্তান—চৌদ্দ, বার, দশ, আট—নিয়ে তিনি বিপত্নীক হলেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁর মেজ মেয়ে রেণুকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু হোল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বিপুল ব্যয়ভার-বিব্রত কবি রুগ্না কন্যা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিয়ে আজ হাজারীবাগ, কাল আলমোড়ায় রোগী-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তারই মধ্যে অবিরাম চলেছে লেখনী। "বঙ্গদর্শন"-সম্পাদনা, উপন্যাস-রচনা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শিশুপুত্র-বিনোদনে "শিশু"-র কবিতা রচনা। মেজ মেয়ের মৃত্যুর চার বৎসর পরেই অকস্মাৎ হারালেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে, যে ছিল তার পিতার অবিকল রূপমূর্তি। তাঁর প্রবাসী কোন বন্ধু† লোকমুখে এ-খবর শুনে কবিকে এক চিঠি লেখেন।

* "বিশ্বভারতী পত্রিকা"—বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫১

† শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদ্যযুগের শিক্ষক, পরে সম্বলপুরের উকীল, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরে তিনি লিখছেন—

> "যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়ীতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল —তাহার পরে আর ফিরিল না। আমি আগামী কল্য শিলাইদহে যাইব। সেখানে মেয়েদের লইয়া কিছুদিন থাকিব। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বোলপুরে আমার কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।" [১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫]

"তাহার পরে আর ফিরিল না।" পিতৃ-হৃদয়ের সমস্ত শোক-ব্যথার প্রকাশ শুধু ঐ ক'টি কথায়! এই অতুল সংযম ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনের তুলনা বড় কোথাও আছে বলে জানি না। এই আঘাতের ঠিক এক বৎসর পরেই কবি তাঁর মেজ জামাই সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে সেই বন্ধুকেই লিখছেন—

> "সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল। অদ্য মাস পাঁচ-ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া আবার তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পূজোর ছুটিতে আমাদের কোন কোন অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন—দীনুও গিয়াছিল। সত্য কাহারও নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া গেল। লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দীনুকে জ্বরে ধরিল। দীনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চারদিনের জ্বরে ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।"

মৃত্যুর লীলার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় তাঁর কাব্যস্রোতে যে-রূপে প্রবাহিত, তার উৎসের ইঙ্গিত রয়েছে এই দু'টি সাধারণে অপ্রকাশিত চিঠির মধ্যে। বারে বারেই "মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি" হতে হয়েছে তাঁকে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর বড় মেয়ে বেলা দেবী চলে গেলেন ১৯১৭-তে। তাঁর এক মাত্র দৌহিত্র, 'নীতু', কবির মৃত্যুর খুব বেশিদিন আগে নয়, তরুণ বয়সে জার্ম্মানীতে মারা গেলেন। তাঁর প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বগুণান্বিত সুরেন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর আগে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। এই সমস্ত শোক বহন করে অবিচলিত নিষ্ঠায় কবি তাঁর কাজ করে গেছেন,—নিজের ব্যক্তিগত বেদনাকে কোনদিন কোন বাধা সৃষ্টি করতে দেননি তাঁর কোন কাজে।

কর্তব্যে দৃঢ়িষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য মানুষ। সংসারে ছোট-বড় কোন কর্তব্য-করণীয়কেই তিনি অবহেলা করেননি। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর "চিঠিপত্র" পড়ে দেখুন—সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর সমদৃষ্টি। কোথা থেকে ভাল ঘি, কোথা থেকে সম্বৎসরের ডাল সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন সংসারের ভাঁড়ারে। আবার বা কোথাও থেকে রাঁধবার লোক ঠিক করে পাঠাচ্ছেন কলকাতায় স্ত্রীর কাছে; মাইনে আট টাকা—বাংলা ও ইংরেজী রান্নাও জানে কিছু কিছু। শুধু স্ত্রী-পুত্রদের রোগে সেবা নয়, ভাইপোদের অসুখে রোগশয্যার পাশে রাত কাটাচ্ছেন বসে; দেহতাপ দেখছেন, ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, তাঁদের সংবাদ দিচ্ছেন স্ত্রীকে চিঠি-পত্রে। মনে পড়ছে অনেক বছর আগে "প্রবাসী"-র পৃষ্ঠায় তাঁর পরম প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের মাতার স্মৃতিকথা। শেষের রাত্রিতে যখন বলেন্দ্রনাথের জীবন-দীপ নিবু-নিবু, তখন আসন্ন মৃত্যু-পথযাত্রীর ঘর থেকে ভ্রাতৃবধূকে বাইরে নিয়ে এসে যে-ক'টি কথা তাঁকে কবি বলেছিলেন, সেই কথা ক'টি তাঁর সারা জীবনের পাথেয় হয়ে রইল।

নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কত বিরোধ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর কত কটু-তিক্ত সমালোচনায়, কলুষিত নিন্দায় দেশ ছেয়ে গিয়েছে। কত বাদ-বিতর্ক-বিতণ্ডা আবর্তিত হয়েছে তাঁকে ঘিরে—মাসিকে, দৈনিকে, বৈঠকে, এমন কি সভা-সমিতিতেও। কিন্তু তিনি অবিচলিত থেকেছেন চিরদিনই। রবীন্দ্র-কাব্যকে অশ্লীল আখ্যা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন মাসের পর মাস আক্রমণ চালালেন—মর্ম-ভেদী ব্যঙ্গ-বাণে, কঠিন পরুষ বাক্যে তাঁকে জর্জ্জরিত করলেন,—কিভাবে তিনি সেটা নিয়েছিলেন তা' পরিষ্কার হবে যদি আপনাদের কাছে একখানা চিঠি পড়ে শোনাই। এ চিঠিও সাধারণে অপ্রকাশিত; তাঁর সেই বন্ধুটিকেই লেখা—

> "ও সব কথা আর তুলবেন না—যা' প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তাকে যেতে দিন—জীবনের কত স্তুতি-নিন্দা, কত সম্মান-অপমানের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি—সদ্য যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে—এম্‌নি

২

করে একদিন সমস্ত বাদ-বিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব, তার পরে যা' সত্য তাই স্থির হয়ে থাকবে, তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও লাভ থাকবে না, কোন লোকসানও থাকবে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন, আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়—অন্ততঃ আমিতো এইখানেই চুকিয়ে দিলুম। আগুনের উপর কেবলই ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব। দূর হোক গে, সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি।" [৮ই ফাল্গুন, ১৩১৪]

এই ভাব তিনি চিরদিনই সমভাবে রক্ষা করেছেন। অসাধারণ ছিল তাঁর তিতিক্ষা, তাঁর ক্ষমা, তাঁর করুণা, তাঁর মৈত্রী। তার বহু পরিচয় তাঁর জীবনে তিনি রেখে গিয়েছেন। মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন বলে, অত্যন্ত আপন এবং প্রিয় মানুষের কাছ থেকে পর্য্যন্ত বহু আঘাত পেয়েও কোনদিন তিনি তা' ফিরিয়ে দেননি,—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

আজ আর সময় নেই সে-সব বিস্তারিত আলোচনার। শুধু আজ এই দিনে সেই বিরাট প্রাণ-মহিমার উদ্দেশে আপনাদের প্রণিপাতের সঙ্গে আমার প্রণতি নিবেদন করবার যে-সুযোগ আমি পেলাম, তার জন্য বারম্বার নতশিরে নমস্কার জানাই আপনাদের সকলকে—আপনাদের প্রত্যেককে।

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৮।৩০শে বৈশাখ কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ম্মচারীসংঘ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একাশীতিতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ

আপনারা আমার আজকের অভিভাষণের আখ্যা শুনে চম্‌কে বা হেসে উঠবেন না। 'কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেরাণীরূপে কোন দিন কোলকাতার কোনো সওদাগরী হৌসে চাকরী করেছেন। তা-যে তিনি করেননি সে-ত আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এটাও জেনে রাখা ভাল যে, ধরুন যদি তিনি এই কর্পোরেশনেই কাজ করতেন, তবে সে-কাজ তিনি ভাল ক'রে, নিখুঁত ক'রেই করতেন, আমাদের রামিয়া-সাহেবের* মত কুড়ি টাকায় চাকরীতে ঢুকে, হাজার টাকা মাইনের সেক্রেটারীগিরি তিনি অনায়াসেই ক'রে যেতে পারতেন; —চাই কি, হয়ত, আমাদের 'বড় সাহেব'-এর† চেয়ারেও বসতেন। অনেক বছর আগে, চিত্তরঞ্জন দাশ-মশাই এক দিন আমাকে বলেছিলেন,— "ভাগ্যিস্, তোমাদের গুরুদেব বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হ'য়ে আসেননি, তা হ'লে আর আমাদের ব্যবসা জমাতে হোত না।" কথাটা দাশ-সাহেব, —তখন তিনি ব্যারিস্টারি করেন,—পরিহাসছলেই বলেছিলেন বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি:—কেন-না বিধাতা ললাটে রাজটীকা দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; যেখানে যে-ক্ষেত্রেই তিনি যেতেন, সেখানেই ব'সতেন তক্তুতাউষে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু যাক সে-কথা। আমার অভিভাষণের আখ্যা "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" কি-অর্থে দিয়েছি সেই কথাটা বলি। "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" মানে আমি এই করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ কেরাণীকে কি চোখে দেখেছেন, কি রূপে এঁকেছেন,—তাঁর সৃষ্টিতে কেরাণীর ছবি ফুটেছে কি রকম।

* বি. ভি. রামিয়া।

† জে. সি. মুখার্জ্জি।

আমরা এখানে প্রায় সবাই কেরাণী, অর্থাৎ কি-না কলম পিষে খাই; মাস গেলে মাইনে গুণে,—অবশ্য 'কাট্' বাদ দিয়ে,—বুক-পকেটে পিন এঁটে নোট ক'খানি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে যাই; সমর্পণ করি সর্ব্বংসহা গৃহিণীর করকমলে;—সকাল হতে না হতেই আসে বিল হাতে বাড়ী-ওয়ালার দারোয়ান, খেরোবাঁধা খাতা হাতে মুদী, ফর্দ্দ নিয়ে গোয়ালা; —তারপর মাসের বাকী দিনগুলো কাটাই মাস-কাবারের মুখ চেয়ে। আমিও আপনাদেরই একজন, নামে শুধু 'এডিটর';—কাজেই আমার মুখে শোনাবে ভাল, কেরাণীর কথা রবীন্দ্রনাথ কেমন বলেছেন; আপনাদেরও নিশ্চয় ভালো লাগবে সে-কথা শুনতে।

প্রথমেই একটা কথা বলি। কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে 'প্রগতি'-বাদীদের মুখে—'রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি; তিনি শুধু এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বড়লোকদের ছবি; দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন কি তা' তিনি জানেন না, গরীব লোকের খবর তিনি রাখেন না!' বার বার একটা কথা ব'ললে কথাটা অবশ্যই সত্যি হয় না, কিন্তু হ'য়ে দাঁড়ায় সেটা 'ধর্ত্তাই বুলি'—যাকে বলে ইংরেজীতে catchword! হয়েছেও তাই। সেই যে কবে বিপিন পাল-মশাই "বঙ্গদর্শন"-এ লিখে-ছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের কাব্য বস্তুতন্ত্রহীন',—সেই থেকে সুর ধরলেন এক দল,—বাংলার গীতি-কবিতার সত্য রূপটি ফোটেনি তাঁর কাব্যে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে নেই নাকি তার যোগ। টিঁক্‌লো না কিন্তু এই সব টিপ্পনী, দেশ নেয় নি ও-সব সমালোচনা। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বরাবরই বেশী; তাই বড় বড় মহারথীদের নারায়ণীসেনা যখন গেল ভেসে, বৈষ্ণবরসতত্ত্ব আর উজ্জ্বল-নীলমণি, রাইকিশোরী আর বাংলার রূপ গেল মুছে, তখন এই সব সমালোচকেরা মার্ক্সিস্ট্ বুলি আউড়িয়ে, কড্‌ওয়েল কপ্‌চিয়ে, Illusion আর Reality-তে গুলিয়ে ফেলে চেঁচামেচি সুরু করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ "আন্তর্জ্জাতিক কল্পনাবিলাসী, সৌখীন সাহিত্যের স্রষ্টা"; তাঁর "রঙ-বেরঙের ঝুঁটিওয়ালা কচি কচি মিষ্টি বুল্‌বুলি ভাষা"; রবীন্দ্রনাথ না কি "সমস্ত রকমের আধুনিকতার বিরোধী", শুধু "সমাজ ও বাস্তবজীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে তিনি অনাবিল সৌন্দর্য্য ও ব্রহ্ম-স্বাদস্বরূপ 'রসের'

মধ্যে নিমজ্জিত”! এ-সব তাঁদেরই কথা, আমি উদ্ধার করছি মাত্র! এই সব মার্ক্সিস্ট্ মৌলানারা ফতোয়া জারী করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ‘বুর্জোয়া’, অতএব তিনি ‘ব্যাক নাম্বার’! নূতন সাহিত্য ও সমালোচনার নামে এই সব বিনয়ীরা বুঝোতে চাচ্ছেন আমাদের,—আমি আবার তাঁদেরই ভাষা উদ্ধার করছি,—যে রবীন্দ্রনাথের কাছে “মানুষ বা মরজগতের জয় হয় নি”; “তাঁর ‘এবার ফিরাও মোরে’ আহ্বান দিগ্ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরাণি”; তিনি “বাদশাহ রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জ্জন নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে” আছেন; তিনি “সামন্ত-তন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে......মুক্তির আশ্রয় খুঁজছেন;” তিনি “সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজামহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠীর......পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এবং তাঁর বিমূর্ত্ত কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মানবপ্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণী-প্রীতির মহিমা কীর্ত্তন করছে”*। এ সাম্যবাদী সমালোচকেরা জানাতে চান যে, যেহেতু নাথ চোখে ডায়্যালেক্টিক্সের ঠুলি এঁটে সাহিত্যের ঘানি টানেন না, সেই হেতু তাঁর সাহিত্য সেই তেল যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আজকের দিনে মানুষের ঘরে নাকি আলো আর জ্বলবে না।

বলা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিচার নাকি ‘সাম্যবাদী’ এবং ‘সাম্প্রতিক’ সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচনা-সম্মত! আমি বলি, এই বিচার, এই সমালোচনা ‘সাম্যবাদী’ নয়, সত্যবাদী ত নয়ই! কিন্তু যাঁরা এই বিধান দিয়েছেন, সেই নতুন গোঁসাইয়ের দল, আর কিছু না জানুন, দল-ভারী করবার বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছেন যথেষ্ট! দুঃখ এই যে, আমাদের খবরের কাগজের ঢাকীরা আছেন সব সময়েই তৈরী ঢাকের কাঠি নিয়ে—এঁদের ঢাক পেটাবার জন্য। নির্ব্বিচারে, নির্ব্বিকারে এঁরা ছাপিয়ে দিচ্ছেন এঁদের এই সব মূঢ় আলোচনা, আর ভাবছেন কী গূঢ়ই না হোল মার্ক্সিস্ট্-দর্শনের অপব্যাখ্যার প্রলাপ,—সাহিত্যের এই নব তত্ত্ব! এক দিন ছিলাম আমরা ইংরেজ গুরুর পাঠশালার ছাত্র,—

* “নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা”—বিনয় ঘোষ। নূতন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা।

গুরুমশাইয়ের সব কথাই ছিল আমাদের কাছে বেদবাক্য: আজ সেই আসনে বসিয়েছি মার্ক্সিস্ট্ মাস্টারমশাইদের; মাস্টার বদ্‌লেছে বটে, কিন্তু মন বদলায় নি,—সে দাসত্ব করছে চিরদিন!

আরো দুঃখ এই যে, খবরের কাগজ শুধু নয়, ত্রৈমাসিক আছেন, 'অভিজাত' মাসিক আছেন—যাঁদের কেউ কেউ নৈবেদ্যের চূড়ার উপর সন্দেশের মত রবীন্দ্রনাথেরই লেখা ছাপিয়ে, সেই কথামালার শৃগাল ও শিকারীদের গল্পের মত, ইঙ্গিতে দেন দেখিয়ে, ভঙ্গীতে দেন জানিয়ে যে, রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে পড়েছেন এবং তিনি নাকি হাঁপিয়ে উঠেছেন নব্যদের তালে পা ফেলতে গিয়ে:—'আহা বুড়ো মানুষ, খেটেছেন, সারাজীবন যথেষ্ট, পারবেন কেন?' এই সব পত্রিকার পংক্তিতে মিশিয়ে থাকে কেমন যেন একটা অনুকম্পার সুর, একটু দরদের রেশ। এঁরা একটা নতুন কথা তৈরী করেছেন—একটা নতুন সাহিত্য আবিষ্কার করেছেন: তার নাম "রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য"। আপনারা ভুল বুঝবেন না। "রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য" মানে রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী সাহিত্য নয়,—রবীন্দ্র-অতিক্রান্ত-সাহিত্য, অর্থাৎ কি না যে-সাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এঁরা দল বেঁধে, মহোৎসাহে পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন ক'রে, নিজেদের কাগজে নিজেদের বন্ধুদের দিয়ে নিজেদেরই গল্প কবিতার সুদীর্ঘ আলোচনা ছাপিয়ে জাহির করছেন যে, "আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর" এবং "বাংলা কবিতার এ উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী" না কি এঁদেরই পরিচালিত একখানি ত্রৈমাসিকী।* আর একখানি কাগজে,—যা ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে 'নবকলেবর' লাভ করেছে,—খ্যাতনামা এক অধ্যাপক-সাহিত্যিক, আমারই বিশেষ বন্ধু, কিছুকাল পূর্ব্বে প্রচার করলেন যে, আধুনিক কবিতা ব'লতে যা বোঝায়, তা' কেবল একমাত্র তাঁরই বন্ধু কবি-সম্পাদকের রচনাতেই রূপ ধরেছে,—আর বাকী যা সব মেকি! শুনে আশ্চর্য্য হবেন কি যে, এ-লেখাটি সে-কাগজে শ্রেষ্ঠ

* বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "বৈশাখী বার্ষিকী", প্রথম সংখ্যা ১৩৪৮—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য'—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

সম্মানের আসনই লাভ করেছিল?* এঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং নিজেদের কাছে ও নিজেদের কাগজে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছেন যে, "রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত নতুন বাংলা সাহিত্য,"—গল্প কাব্য সব কিছু এঁরা সৃষ্টি করেছেন: অতএব রবীন্দ্রযুগ অবসান—Q. E. D.!

কিন্তু যাক এ-সব "সত্যম্ অপ্রিয়ম্"। শাস্ত্রের "মা ব্রুয়াৎ" আদেশ শিরোধার্য ক'রে আমার আসল বক্তব্যে এসে পড়া যাক। বক্তব্যটা আমার এই—রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তিনি রাজারাজ্ড়া নিয়ে কারবার করেন নি; আপনার আমার মত সাধারণ লোক, যারা খেটে খায়, আপিসে চাক্‌রী করে, তাদের কথাই বলেছেন; তার চাইতে একটুও কম বলেন নি, দুঃখে পীড়িত, অভাবক্লিষ্ট, পরমসহিষ্ণু বাংলার পল্লীবাসীদের কথা;—তাদেরই তিনি রূপে রসে মূর্ত্তি দিয়েছেন অপরূপ:—সে-মূর্ত্তি মানুষের চিরন্তন মূর্ত্তি, দেশ ও কালের পাত্র ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা' সকল কালের, সকল মানবের মর্ম্মস্থলে।

আর একটি কথা এখানে বলবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। সে কথাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যপ্রকাশিত "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" গ্রন্থখানিতে খুব ভাল ক'রে বলা হয়েছে।† সেটি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু উপন্যাসের উপাদান খুঁজেছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাইরে। রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম বাংলার ও বাঙালীর বাস্তব জীবনের ছবি আঁকলেন তাঁর ছোট গল্পে। রোমান্স্ নয়, রাজারাজ্ড়ার লড়াই নয়, বাংলার পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের ছবি,—ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-দেখা।

"পোস্ট্‌মাস্টার" নিশ্চয়ই পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আদ্যযুগের সৃষ্টি—পঞ্চাশ বছর আগে লেখেন "হিতবাদী" কাগজে। গল্পটা কাকে নিয়ে? গণ্ডগ্রামের গরীব 'ডাকবাবু'—অখ্যাত, অজ্ঞাত—কেরাণীরই সামিল: গৃহছাড়া, সঙ্গীহীন—সে শুধু রতনের মনিব।

---

* সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত "পরিচয়", বৈশাখ ১৩৪৭—'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য'—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

† রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রতন কে? সামান্য গ্রাম্য বালিকা; পোস্ট্‌মাস্টারের দুটি ভাত সিদ্ধ ক'রে, দু'খানি রুটি গ'ড়ে দেয়, আর তার বিচ্ছেদকাতর দিনগুলিকে পূর্ণ ক'রে তোলে। শেষে এক দিন এল বিদায়ের পালা, অশ্রুসজল রতনকে রেখে মাস্টারমশাই "নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল......"

এই "পোস্ট্‌মাস্টার" গল্পটিতে যে-সুরের আভাস, তার পূর্ণ পরিণতি দেখি "সমাপ্তি"-তে। কেরাণীর একমাত্র কন্যা—পোষ-না-মানা বন্যা হরিণীর মত চঞ্চলা মৃন্ময়ী। বাপ চাকরী করে বিদেশে; ষ্টীমার ঘাটের মাল ওজন, মাশুল আদায় হোলো তার কাজ; মেয়ের বিয়েতে আসবার ছুটি হোলো না তার মঞ্জুর।

...মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি ষ্টীমার কোম্পানির কেরাণীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড্‌ আফিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল। [—সমাপ্তি : "গল্পগুচ্ছ"]

সেই গরীবের ঘরে হোল একদিন সহসা মেয়ে জামাইয়ের আবির্ভাব—অপূর্ব্ব আর মৃন্ময়ী। কী বেদনার রসে আনন্দ-উচ্ছল সেই মিলনের দৃশ্য!

...টিনের ঘরে একখানি ময়লা চোকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন।

এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই। ঈশানের চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী: এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরাণী নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেম্‌নি দারিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এম্নি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত ষ্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা! এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিল রাঁধাবাড়া। তাহার পর মৃন্ময়ীর বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহহস্তের পরিবেষণে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শন-পূর্ব্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরো কিছুদিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুর-ঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল। [—সমাপ্তি: "গল্পগুচ্ছ"]

দারিদ্র্যের অভাব-অনটনের এই ছবিটির উপর কবি তাঁর যাদুকাঠি বুলিয়ে, অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চারে আমাদের হৃদয়-মন অভিষিক্ত ক'রে দিলেন—কেরাণী জীবনের কালি নিমেষেই সোনা হয়ে গেল। দুঃখ

আছে, দারিদ্র্য আছে; অভাব-অনটন ত নিত্য সহচর, কিন্তু সে সমস্ত ছাপিয়ে গেল গরীব কেরাণী বাপের সেই তিন দিনের আনন্দ। মানব-হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব পরিচয়ে নিবিড়, স্নেহ-সুকোমল, প্রশান্তি-গভীর এই অন্তর্দৃষ্টি কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত রবীন্দ্রনাথের সহজাত। কোনো বিশিষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কোনো জীবনসম্পর্কহীন যান্ত্রিক মতবাদ থেকে এর জন্ম নয়। অশেষ বিধিনিষেধ বাধাবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির নানা বিচিত্র প্রকাশ আহত ও সঙ্কুচিত, সেখানে কবি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, একান্ত আত্মীয়তাবোধের সাহায্যে, গল্পের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং সুদুর্লভ মনোবিশ্লেষণশক্তিতে হৃদয়লীলার যথার্থ রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধ'রে দিয়েছেন! তাঁর কল্পনার ছোঁয়া লেগে সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করে; তা' ব্যক্তিবিশেষের দুঃখকে, কোনো বিশেষ ঘটনার বেদনাকে, সকলের বেদনার ভিতরে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়। অথচ তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুকে নিয়েই তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির সূত্রপাত কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব কল্পনা বাস্তবকে ছাড়িয়ে, রসের ঊর্দ্ধলোকে উঠে, সেই সৃষ্টিকে অপরূপ ঐশ্বর্য্যমহিমায় মণ্ডিত ক'রে দেয়।

এই রসসৃষ্টির জন্য 'ফিউডল্', কি 'মিডিভল্', 'বুর্জ্জোয়া' বা 'প্রোলিটেরিয়েট্' কোন সমাজতন্ত্রের বিশেষ পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের প্রয়োজন হয়নি রবীন্দ্রনাথের;—সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে তাঁর রস-অনুভূতি সমান। "এক রাত্রি" গল্পের 'বিপুল বিরতি', অপূর্ব্ব কারু-সংযম গরীব স্কুলমাস্টারকে আশ্রয় ক'রেই ফুটে উঠেছে। "মহাপ্রলয়ের তীরে" সুরবালার পাশে দাঁড়িয়ে "অনন্ত আনন্দের আস্বাদ" হোল সেই "ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।" "মধ্যবর্ত্তিনী" গল্পের অপরিসীম আবেগ তিনটি মানুষের জীবনকে আলোড়িত ও বিধ্বস্ত ক'রে গহনগোপনচারী মানব-মনের যে বিচিত্র-সূক্ষ্ম পরিচয় দিল, তা "ম্যাকমোরান কোম্পানীর আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র"-কে নিয়ে। পরাধীন দেশের সমস্ত গ্লানি, বেদনা, নিষ্ফলতা, অন্যায়, অত্যাচার, অপমান পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইলো "মেঘ ও রৌদ্র" আখ্যানে—"ক্ষীণ-দৃষ্টি মক্কেলহীন গ্রাম্য

উকীল” শশিভূষণের ব্যর্থ জীবনে; শুধু বুলিয়ে দিলে তার হৃদয়ক্ষতে স্নেহপ্রলেপ তার শৈশব-ছাত্রী “নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা”।

“গল্পগুচ্ছ” পড়ুন,—দেখবেন, কবির সৃষ্টিতে কেউ বাদ যায়নি। “অতিথি” গল্পে সেই জন্ম-‘ভ্যাগাবণ্ড্’ তারাপদ ছোক্‌রাকে মনে পড়ে? সেই “আসক্তিবিহীন উদাসীন ব্রাহ্মণ বালক”, যার ‘পথ চলাতেই আনন্দ’, যাকে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবু, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা বা তাঁদের মেয়ে চারু কেউ ধ’রে রাখতে পারলে না,—যে এক দিন বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য হ’য়ে গেল। তার সেই পালানোর দৃশ্যটা মনে আছে? শুনুন, পড়ি—

> দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূরে অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।
>
> [—অতিথি : “গল্পগুচ্ছ”]।

‘সমাজ-সচেতন’ মনের কথা আজকাল খুব শোনা যাচ্ছে। এই social consciousness রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে দেখবেন ওতপ্রোত হ’য়ে রয়েছে। পণ্যা নারী নিয়ে তিনি কোনো দিনই মাতামাতি করেননি —তাঁর গল্প বা উপন্যাসে; কিন্তু যে সামাজিক আবেষ্টনে ও অবিচারে পতিতার সৃষ্টি, যে একদেশদর্শিতায় তার চরম গ্লানি ও নির্য্যাতন, তা’ তাঁর মনকে কি-ভাবে নাড়া দিয়েছে, তা’ পাবেন তাঁর “বিচারক” গল্পে। মনে রাখবেন, এ-গল্প Tolstoy-এর “Resurrection” উপন্যাসের

আগে লেখা এবং বাংলা কথাসাহিত্যে পাইকারী হিসাবে পতিতা আমদানী হবার বহু পূর্ব্বে রচিত। আমি ত মনে করি এই একটি গল্পে এ-সমস্যা সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত রয়েছে, তা' আধুনিক বা অতি-আধুনিক অনেক গল্পেই খুঁজে পাওয়া শক্ত।

নারী-জাগরণ, নারী-বিদ্রোহের বাণী থেকে থেকে খবরের কাগজে, বক্তৃতামঞ্চে আত্মঘোষণা করছে কিছুকাল হ'তে এদেশে। সে স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ মহীয়সী বাণী পাবেন "স্ত্রীর পত্র"-এ, "পলাতকা"-র 'মুক্তি' কবিতায়—বিনুর বাইশ বছরের জীবনের ব্যর্থতায়। জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস-কে নিয়ে যে "চতুরঙ্গ", তাতে পাবেন নরনারীর আদিম সম্বন্ধের উপর রস-সমুদ্রের যে-ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়লো, হৃদয়ের হাপরে যে-আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো, সেই বিষয়ে এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমন সূক্ষ্ম বিচার, যা' পড়বার পর মনে হবে, যৌনসমস্যা নিয়ে লেখা রাশি রাশি দেশী-বিদেশী কাহিনী পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি মাত্র।

'ছোটলোক' যাদের বলা হয় তাদের গল্প চান? ছিদাম চন্দরার কথা পড়ুন "শাস্তি"-তে,—সেই ছিদাম আর তার ভাই দুঃখী। দু'জনে জমিদারের কাছারীতে সারাদিন না খেয়ে বেগার খেটে এসেছে। বৌয়ের কাছে ভাত চেয়ে না পেয়ে দুঃখী খুন ক'রে বসলো তাকে। তার পর ভাইকে বাঁচাবার জন্য ছিদাম খুনের দায় চাপালে তার বৌ চন্দরার কাঁধে।......চন্দরা 'হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল', 'একখানি নূতন তৈরী নৌকার মত সুডোল' দেহ যার। মনে পড়ে, ফাঁসীর আগে 'দয়ালু সিভিল সার্জ্জন' যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার স্বামীকে দেখতে চায় কি না তখন সে কি বলেছিল? এমন বস্তুনিষ্ঠ অথচ এমন রস-সার্থক গল্প বেশি পাবেন কি কোথাও?

কিন্তু আমি বোধ হয় "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। সুতরাং ফিরে যাওয়া যাক আবার কেরাণী-জীবনের কথায়। কেরাণী-জীবনে রোমান্স্ খোঁজেন যদি ত পাবেন তা' "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ। গল্পের নায়ক, বরীচের বাজারে তুলার মাশুল-আদায়কারী শুস্তার শুষ্ক বালুতীরবর্ত্তী শা-মামুদের পরিত্যক্ত প্রাসাদবাসী সেই

বাঙালী ভদ্রলোকটি—কেরাণীই। সারা দিন কলম চালিয়ে এসে যখন সে সূর্য্যাস্তের পর, নিষ্ফল কামনার অভিশাপে অভিশপ্ত সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সে হ'য়ে ওঠে শত শত বৎসরের পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি ব্যক্তি; জড়িয়ে পড়ে সে একটা নেশার জালের মধ্যে; তাকে ঘিরে সেই বিজন প্রাসাদের বিস্তীর্ণ কক্ষগুলিতে বিস্তৃত হয় এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল। তখন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠে ব'সে সে শুনতে পায়—

> ...কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া, তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!
>
> আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিনী! তুমি কোন শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ গৃহহীনা দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দামী হাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবন-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণ মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির

পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগ্‌লা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায়, সব ঝুঁট্ হ্যায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে;...... [—ক্ষুধিত পাষাণ : "গল্পগুচ্ছ"]

কেরাণী-জীবনের ঝুঁটা রোমান্স্ এম্‌নি ক'রেই ভাঙ্গে বটে—রূঢ় *আলোকে!*

"চোখের বালি"-তে দেখি বিহারী যখন বিনোদিনীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে "নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে", তখন "কলিকাতার দরিদ্র কেরাণীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে।" কবি লিখছেন—"গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলিনিবাসী অল্পাশী পরিবার-ভারগ্রস্ত কেরাণীর বঞ্চিত জীবন সেইরূপ; —সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।"

শুধু কেরাণী-জীবনের দুঃখকষ্টই যে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে তা নয়; তার অন্য দিকটা,—যেখানে শত দুঃখের মধ্যেও হাসি উঁকি মারছে, সে-দিকটারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মনে পড়ে কি "গোরা"-তে মহিমের আপিসের ডালকুত্তার মতো নতুন বড় সাহেবের কথা,—খবরের কাগজে যার নামে চিঠি বেরিয়েছে ব'লে মহিমকেই তার লেখক ব'লে সন্দেহ করেছে? পড়ে শোনাই আপনাদের সেখানটা। গোরা আর বিনয় গোরাদের বাড়ীতে ব'সে, ভারতবর্ষের প্রতি "সঙ্কোচহীন, সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা" কেমন ভাবে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সঞ্চার ক'রে দেওয়া যায় সেই আলোচনা করছিলেন—

এমন সময় হাতে একটা হুঁকা লইয়া মৃদুমন্দ অলস ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং গোটা ছয়েক পান বাটায় লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটি

একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা জুটিবে, তখন সদর দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার সভা বসিবে।

মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! মহিম হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিল, "ভারতউদ্ধারে ব্যস্ত আছো, আপাততঃ ভাইকে উদ্ধার করো তো!"

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন— "আমাদের আপিসের নতুন যে বড়ো সাহেব হ'য়েছে—ডালকুত্তার মতো চেহারা—সে বেটা ভারি পাজি। সে বাবুদের বলে বেবুন—কারো মা মরে গেলে ছুটি দিতে চায় না, বলে মিথ্যে কথা—কোনো মাসেই কোনো বাঙালী আমলার গোটা মাইনে পাবার জো' নেই, জরিমানায় জরিমানায় একেবারে শতছিদ্র করে ফেলে। কাগজে তার নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিলো—সে বেটা ঠাউরেচে আমারই কর্ম্ম। নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখলে টিঁকতে দেবে না। তোমরা তো য়ুনিভারসিটির জলধি মন্থন করে দুই রত্ন উঠেছো—এই চিঠিখানা একটু ভালো ক'রে লিখে দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে even-handed justice, never-failing generosity, kind courteousness ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গোরা চুপ্ করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কহিল, "দাদা, অতগুলো মিথ্যে কথা একনিশ্বাসে চালাবেন?"

মহিম—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের সংসর্গ ক'রেচি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই। ওরা যা মিথ্যা কথা জমাতে পারে সে তারিফ করতে হয়। দরকার হ'লে ওদের কিছুই বাধে না; একজন যদি মিছে বলে তো শেয়ালের মত আর সব কটাই সেই সুরে হুক্কাহুয়া ক'রে ওঠে, আমাদের মতো একজন আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা।

বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন—বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। [—"গোরা"]

আর নয়: এবার শেষ করা যাক; তা না হোলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে কেরাণীর পরিচয় আপনাদের একটু দিতে পেরেছি আশা করি। কিন্তু ভুল করবেন না; এ-পরিচয় তাঁর কথা-সাহিত্যের অত্যন্ত আংশিক পরিচয়মাত্র; আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই আমি তাঁর গল্প উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছি মাত্র।

আর একবার আমার এই অসম্পূর্ণ অভিভাষণের গোড়ার কথায়, আপনাদের অনুমতি পেলে, ফিরে যাই। আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ধর্তাই-বুলির জালে বাঁধা পড়বেন না, তথাকথিত 'বামমার্গী' সাহিত্যিকদের সমালোচনায় বিভ্রান্ত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের—সম্পূর্ণ মানুষের—কবি, মতবাদের কবি নন; মানুষের যা-কিছু ভাল বা মন্দ, দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা-ব্যর্থতা সব রূপ নিয়েছে তাঁর রচনায়—তাঁর কবিতায়, গল্পে, গানে!

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে, সাড়া তার
জাগিবে তখনি।"

মন তাঁর চিরচঞ্চল, 'সুদূরের পিয়াসী'; সে চিরদিনই বলেছে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। স্থিতিতে তাঁর বাসা নয়, স্থাণুতে তাঁর আস্থা নেই। তাই আজ একাশী বৎসর বয়সে জরা যখন এসে আক্রমণ করেছে দেহ,—তখনও অনন্ত প্রাণবেগবান কবি নূতন ধরিত্রীর আগমন-প্রত্যাশায় অধীর। শুনুন তিনি কি ব'লছেনঃ

"এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,—
মানব তপস্বী-বেশে
চিতা-ভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে;
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।"

সেই সৃষ্টির আহ্বানে আসবে কারা? যারা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলায়, তারা নয়। কারা? কে?

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি—"

কবি তার, তাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কাদের জন্য? না, যারা—

"চিরকাল—
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ......
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
গুরু গুরু গর্জন গুণ গুণ স্বরে
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি' দিনযাত্রা করিছে মুখর
দুঃখসুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের
ভগ্ন শেষ 'পরে
ওরা কাজ করে!"

এর পরেও কি মার্ক্স্‌বাদী বলবেন—"দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে-মানুষের স্বীকৃতি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ-জগৎ সৃষ্টি করবে"? *

* সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত "পরিচয়"—রবীন্দ্রসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৮—'মার্কস্‌বাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ'—বসুধা চক্রবর্ত্তী।

প্রেমের অভিষেকে কেরাণী

রবীন্দ্রনাথ কি চোখে কেরাণীকে দেখেছেন, তা শুধু তাঁর গল্পে উপন্যাসে নয়,—তাঁর কবিতাতেও তার পরিচয় রয়েছে। "সাধনা" পত্রিকায় ১৩০০ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত, পরে পরিবর্তিত রূপে "চিত্রা" কাব্যে সংগৃহীত, "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটির কয়েক পংক্তি এখানে তুলে দিলেই তা সুস্পষ্ট হবে।

"কী হবে শুনিয়া, সখী, বাহিরের কথা—
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত কিছু! লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি যুঝে মরি একপার্শ্বে তার
এককণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি
আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি
জনস্রোত হতে। সেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্রভার; কভু অনুগ্রহ
কভু অবহেলা সহিতেছি অহরহ—
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কোন ভাগ্যগুণে। অয়ি মহীয়সী রাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। কেন
সখী, নত কর মুখ, কেন লজ্জা হেন

অকারণে। নহে ইহা মিথ্যা চাটু। আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে—
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর। ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী; বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী—
কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপে আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ নাহি মানে, রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে, সৌভাগ্যগরবে
অজস্র উড়ায়ে ধূলি মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে। মনে মনে বলি, "প্রভু
যাও ছুটে যাও; খেলো গিয়ে খেলাঘরে
করো নৃত্য দীপালোকে প্রমোদসাগরে
মত্ত ঘূর্ণাবেগে, তপ্তদেহে, অর্ধরাত্রে
সঙ্গিনীরে লয়ে; উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রে
তুষার গলায়ে করো পান; থাকো সুখে
নিত্যমত্ততায়।" এত বলি হাস্যমুখে
ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা
আনন্দমন্দির মাঝে—নিভৃত নিরালা,
শান্তিময়।—প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি
আমি যেথা রাজা। আমার নন্দনভূমি
একান্ত আমার। দুর্লভ পরশখানি
দুর্মূল্য দুকূল সর্বাঙ্গে দিয়েছি টানি
সগৌরবে; আলিঙ্গন কুঙ্কুমচন্দন
সুগন্ধ করেছে বক্ষ; অমৃতচুম্বন
অধরে রয়েছে লাগি; স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
সুধাস্নাত দেহ। প্রভু, হেথা তব সাথে
নাহি মোর কোনো পরিচয়"......

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি

১৩৫৫ শারদীয়া "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি

১৯১৯ সনের মার্চ্চ মাস।

পুরাণো দিল্লীর ভাইসরয়ের বাড়ীতে—এখন যেখানে দিল্লী য়ুনিভার্সিটির আবাস—ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশন চলচে। বাঙলার ও পাঞ্জাবের বিপ্লববাদীদের সায়েস্তা করবার অজুহাতে, রাওলাট-আইনের নাগপাশে, এ দেশের বন্ধনদশাকে আরও পাকাপাকি করে তোলবার চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছেন গভর্নমেণ্ট। কাউন্সিলে তাঁদের মুখপাত্র, হোম মেম্বর স্যর উইলিয়াম ভিনসেণ্ট। জবরদস্ত দুঁদে সিভিলিয়ান। অতি মোলায়েম—একেবারে মিছরীর ছুরি। লবীতে, দৌড়ে এসে, সুরেন বাঁড়ুয্যে-ম'শায়কে ওভারকোট পরিয়ে দেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলেন না; আর মালবীয়াজীর কথা, মুখ থেকে খসে পড়বার আগেই, যেন একেবারে লুফে নেন। কাউন্সিলের ভিতরে আর এক মূর্ত্তি তাঁর। সেখানে প্রায় এক পক্ষকাল চলেছে দুপক্ষে লড়াই

> "দংশন-ক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ
> যুঝে ভুজঙ্গ সনে।"

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই মনোভাব নিয়ে লড়ছেন,—দেশের প্রতিনিধিরা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে। বিলের এক একটি ধারার মূল প্রস্তাবে পঁচিশটি করে 'সংশোধনী' (amendment) উপস্থাপিত হয়েছে। একা মদনমোহন মালবীয়াই একশো; তাঁর সঙ্গে আছেন বাঙ্‌লার সুরেন্দ্রনাথ, মান্দ্রাজের শাস্ত্রী* আর বোম্বাইয়ের

* শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

জিন্না—সে-দিনের মহম্মদ আলি জিন্না। প্রেস গ্যালারীতে বসে শুনেছি সে বিপুল বিতর্ক।

বিকাল শেষ হয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি এসে পেঁাছেচে। সেদিনের অধিবেশনও অন্তপ্রায়। উঠে দাঁড়ালেন বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্-ফোর্ড। (তখনকার দিনে লাট বাহাদুরই আইনসভার সভাপতি হতেন)। ঘোষণা করলেন, সে-রাত্রে, নৈশভোজনপর্ব্ব সমাধা হবার পরেই, আবার অধিবেশন বসবে; নইলে এত সংশোধনীর আলোচনা অসম্ভব; নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে কাউন্সিলের কাজ সমাপ্ত হবে না। ঝটিতি উঠে দাঁড়ালেন —সুরেন্দ্রনাথ। বল্লেন—"But, my Lord, we go to bed at nine! কিন্তু, হুজুর, আমরা যে রাত্রি ন'টায় শুতে যাই।" লর্ড চেমস্ফোর্ড মৃদু-হাস্যে বললেন,—"Well, Mr. Banerjea, we shall condone your absence!—বেশ, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার অনুপস্থিতি আমরা ধরবো না।"

আবার কাউন্সিলের অধিবেশন বস্লো। একটার পর একটা, যতগুলি 'সংশোধনী'-প্রস্তাব সংখ্যালঘু দেশীয় সদস্যেরা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রত্যেকটি অগ্রাহ্য হোলো—সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ও তাঁদের কৃষ্ণচর্ম্ম অনুচরদের ভোটের জোরে। বোঝা গেল, বিল হুবহু পাশ হয়ে যাবে—পরের দিনই। শ্বেতদ্বীপের মিস্টার জাস্টিস রাওলাট প্রভাস-তীর্থে বৃথাই আসেননি! অধিবেশনের শেষে বেরিয়ে আসছি,—লবীতে দেখলাম স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যর উইলিয়াম ভিনসেণ্ট অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কর্ত্তা মিস্টার কে সি রায়ের (কেশবচন্দ্র রায়) সঙ্গে কথা বলছেন। পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় হঠাৎ একটা কথা কানে এলো—'powder!' বুঝতে পারলাম না কিছুই।

কেশববাবুর সঙ্গে একটু ঘুরে তাঁরই গাড়ীতে, হোটেলে ফেরবার পথে যখন কাশ্মীরী দরওয়াজা পার হয়ে কুদ্সীয়াবাগের ভিতর দিয়ে Maidens-এর দিকে চলেছি, রায়-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ভিনসেণ্ট সাহেব আপনাকে তখন কি বলছিলেন?" উত্তরে শুনলাম—"I smell powder in the air of India, Roy।—আমি ভারতবর্ষের বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছি রায়!"

জনবিরল পুরাণো দিল্লীর রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে; চোখের সামনে ভেসে উঠলো কাউন্সিলের ট্রেজারী-বেঞ্চে উপবিষ্ট গভর্নমেণ্ট-মেম্বারদের মুখচ্ছবি,—ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট, দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠ; কোনো কিছুতেই আটকানো যাবে না তাঁদের—'to teach these beggars a lesson' থেকে। চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠলো আর একটা ছবি,—ক'দিন আগে যা দেখে এসেছি লাহোরে। পুরাণো শহরের মোচি-দরওয়াজার ধারে, মশালের আলোয় চলেছে এক জনসভা, একটা মোষের গাড়ীর উপর একটা টুল চাপিয়ে, তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে এক পাঠান যুবাঃ

> "ইয়ে আপ্‌ লোগ শোচিয়ে, ইয়ে নয়া কানুন যো তৈয়ার হো রহা হ্যয়, ইস্‌মে—'ন্য আদালত, ন্য ভকীল, ন্য আপীল।' সরকারকো এক হাৎমে জহরকা পিয়ালা, ঔর দুস্‌রিমে তলোয়ার—সরকার হামলোগোকো তলোয়ারকা জোরসে জহরকা পিয়ালা পিলানা চাহাতা হ্যয়। সরকারকো হাৎসে জহরকা পিয়ালা ছিন্‌কে তোড়ো জমিন্‌পর—সরকারকো হাৎসে তলোয়ার ছিন্‌কে চালাও দুষ্‌মনপর।"
>
> "আপনারা এই কথাটা ভেবে দেখুন—এই যে, নতুন আইন তৈরী হচ্ছে, এতে না আছে কোর্ট, না আছে উকীল, না আছে আপীল। গভর্নমেণ্টের এক হাতে বিষের পেয়ালা, আর এক হাতে তলোয়ার; গভর্নমেণ্ট তলোয়ারের জোরে আমাদের সেই বিষের পেয়ালা পান করাতে চায়। সরকারের হাত থেকে বিষের পেয়ালা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দাও মাটিতে; সরকারের হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে চালাও শত্রুর উপরে।"

"সাবাস্‌! সাবাস্‌!"—মশালের আলোয় রাঙা আকাশ ভেঙ্গে পড়লো বক্তার জয়ধ্বনিতে। শ্রোতারা সব দোকানী, পশারী, টাঙ্গাওয়ালা, ফেরিওয়ালা! পর পর এই দুই ছবি মিলিয়ে বুঝলাম সংঘর্ষ অনিবার্য। দেখলাম ঈশানের কোণে ঘন ঘোর মেঘোদয়—অনুভব করলাম ঝটিকার পূর্বাভাস—বুঝি বা পেলাম বারুদেরও গন্ধ বাতাসে!

জনমতের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাওলাট বিল পাশ হয়ে গেল। সারা দেশময় তুমুল আন্দোলন, বিপুল উত্তেজনা। গান্ধিজী সে-আইনের সত্যাগ্রহ-প্রতিবাদে ডাক দিলেন তাঁর সঙ্গীদের, তাঁর বন্ধুদের—ডাক দিলেন সারা ভারতবর্ষের লোককে। বেজে উঠলো রণদুন্দুভি—

দিকে দিকে। সেদিন সে-অস্ত্র অজানা ছিল বলেই বুঝি তার উদ্দীপনা ছিল এত বেশি।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের রাওলাট বিল বিতর্ক-আলোচনাক্লান্ত সহকারী-সম্পাদকের ছুটি মঞ্জুর হোলো—"ট্রিবিউন"-অফিসে। মার্চ্চের মাঝামাঝি কলকাতায় এলাম। লাহোর ছাড়বার পূর্বেই দেখে এসেছি ওডায়ারী তাপমানযন্ত্রের পারদরেখা ঊর্ধ্বমুখী; ছোটলাট সাহেব* পোলিটিকাল এজিটেটরদের শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর। আমার 'চীফ' কালীনাথ রায়ের উপর তাঁর আক্রোশটা সবচেয়ে বেশি। তিনি "ট্রিবিউন"-এর সম্পাদক,—তিনি বাঙালী। অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়েই কলকাতায় এলাম। গান্ধিজী তাঁর চিরাচরিত প্রথামতো বড়লাট-বাহাদুরকে জানালেন আবেদন,—সারা দেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি যেন রাওলাট আইনে সম্মতি না দেন। আবেদন অগ্রাহ্য হোল। গান্ধিজী জানালেন যে, এপ্রিল মাসের প্রথম রবিবার, ৬ই তারিখে তামাম্ হিন্দুস্থানে হরতাল হবে,—আর সারা দেশ জুড়ে হবে 'জুলুস্' আর 'জমায়েৎ' এই "কালা-আইন"-এর প্রতিবাদে। তাই দিয়ে সুরু হবে, তাঁর নির্ব্বাচিত আইন অমান্য করে, কারাবরণ। দিল্লীর লোকেরা তারিখটা গোলমাল ক'রে রবিবার, ৩১শে মার্চ্চ হরতাল করে ব'সলো। গুলী চল্‌লো,—লাল্ হয়ে গেল চাঁদ্‌নি চক হিন্দু মুসলিম শহীদের খুনে; গুর্খা সেনাদের বেয়নেটের সামনে কাষায়-বসন দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বুক খুলে দাঁড়ালেন এসে। নিয়ে গেল তাঁকে এক বিরাট মুসলিম 'জলুস্' জুম্মা-মসজিদে; দাঁড় করিয়ে দিলে তারা তাঁকে—আর্য্যসমাজের সেই মহাবীর্য্যবান নিঃশঙ্ক নেতাকে—ইসলামের আচার্য্যের বেদীতে! তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন,—"হিন্দু-মুসলিম এক হো।" সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো দিল্লী থেকে পাঞ্জাবে। ওডায়ারী উত্তাপ বৃদ্ধি পেল আরো।

৬ই এপ্রিলের দেশজোড়া হরতালের ঢেউ পঞ্চনদের কংকরখচিত প্রান্তর দিলে ভাসিয়ে। ভীত-চকিত পাঞ্জাব-সরকার অমৃতসরের হিন্দু-মুসলিম যুগল-নেতা কিচ্‌লু ও সত্যপালকে, ডিফেন্স অফ

* স্যর মাইকেল ওডায়ার।

ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের জোরে, চালান ক'রে দিলেন নিরুদ্দেশে। অমৃতসরের এই দুই 'মুকুটহীন রাজা'-র নির্ব্বাসন-ক্ষুব্ধ এক নিরস্ত্র জনবাহিনী যখন চলেছে ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন জানাতে, তখন তাদের ক'জনকে মারা হোল গুলী করে। তার নৃশংস প্রতিশোধ নিলে অমৃতসরের উন্মত্তা জনতা,—দুটো ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে, আর তার পাঁচজন নিরপরাধ সাহেব কর্ম্মচারীকে মেরে। লাঞ্ছিত হলেন দু'জন মেম-সাহেবও তাদের হাতে। এই অনাচারের খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ গান্ধিজী বম্বাই থেকে পাঞ্জাবে আসছিলেন ছুটে; তাঁকে ঠিক পাঞ্জাবের সীমানাতেই অ্যারেস্ট করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হোল বম্বাইয়ে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আগুন জ্বলে উঠলো সারা পাঞ্জাবে!

লাহোরের খবর ক'লকাতায় বসে পাচ্ছিলাম—কালীনাথ রায় ম'শায়ের কাছ থেকে। ৮ই এপ্রিল কালীবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেলাম যে, লাহোরে জোর গুজব তাঁকে অ্যারেস্ট করা হবে, আমি যেন চলে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকি,—টেলিগ্রাম পেলেই। ১০ই এপ্রিল রাত্রে টেলিগ্রাম এলো—"এখুনি এসো।" সেদিন আর লাহোরে যাবার ট্রেন ছিল না। ১১ই রাত্রে পাঞ্জাব-মেলে রওনা হ'লাম। সেদিন সকালে ক'লকাতায় খবর পেঁৗছেচে—অমৃতসরে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী-বর্ষণের, আর গান্ধিজীর অ্যারেস্টের। সব দোকানপাট গাড়ি-চলাচল বন্ধ। কোন রকমে হাওড়া স্টেশনে পেঁৗছলাম।

১৩ই এপ্রিল বেলা ১২টার আগেই লাহোর পেঁৗছবার কথা। কিন্তু আম্বালায় গাড়ি বদ্‌লিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পরেই ট্রেণ থেকে থেকে চললো থেমে থেমে। অনুসন্ধানে জানলাম যে, আগের দিন না কি জায়গায় জায়গায় রেল-লাইন উপ্‌ড়ে ফেলা হয়েছিল,—তাই এই সতর্কতা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেট করে ট্রেণ যখন অমৃতসর স্টেশনে ঢুকলো, তখন দেখি প্লাটফরম ছেয়ে ফেলেছে গোরা ফৌজ; বড় বড় খিলানগুলো সব বালির ব্যাগ দিয়ে বন্ধ; তার উপরে চড়ানো মেশিন-গান। কাউকে নাম্‌তে দিল না অমৃতসরে। গোরারা এসে গাড়িতে উঠে খানাতল্লাসী সুরু করলে। হঠাৎ কড়কড় কড়কড় শব্দে চম্‌কিয়ে উঠলাম,—আওয়াজ আসছে কাছ থেকেই। কিসের আওয়াজ বুঝতে

দেরি হোল না। একটা গোরাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপারখানা কি? উত্তরে, সে স্টেশনের বাইরে, শহরের দিকে, তার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে জানালে—"Lots of fun going on there—ওখানে দেদার মজা চলেছে।"

সেদিন ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল—সেই বিকালবেলায়—অমৃতসর শহরের একটা পোড়ো জমির উপর রক্তের অক্ষরে লেখা সুরু হোলো ভারত-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। পরদিন সকালেই লাহোরে খবর পেঁছলো জালিয়ানওয়ালাবাগের। সেখানেও দু'দিন আগে গুলী চলেছে আনারকলির বাজারে, দোকানপাট সব কিছু ক'দিন থেকেই বন্ধ। এবার উত্তেজনা উঠ্‌লো চরমে। ওডায়ার হুকুম দিলেন—"খোলো বাজার, খোলো সব দোকান,—নইলে জারী হবে জঙ্গী-আইন।" লাহোরের লোক বল্লে—"সেদিন আনারকলিতে যাদের গুলী করে মেরেছে, তাদের 'মুরদা' দাও আগে ফিরিয়ে।" ওডায়ার সশস্ত্র বাহিনী সাম্‌নে পিছনে রেখে স-পারিষদ অশ্বপৃষ্ঠে এসে ঢুকলেন পুরানো শহরের সংকীর্ণ 'কুচা' 'কাট্‌রার' মধ্যে। "সিয়াপা"-র* ক্রন্দনরোলের ছলনা-পরিহাসে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে অন্তঃপুরিকারা; আর পুরুষেরা, লাটসাহেবের পাশেই পাঠান উষ্ণীষধারী ঘোড়সওয়ার, পাঞ্জাবের নামজাদা খয়ের-খাঁ, তিওয়ানার মালেক ওমর হায়াৎ খাঁকে দেখেই স্বাগত জানালে হাঁক দিয়ে,—"সরকারকো মামা আ গিয়া, সরকারকো মামা আ গিয়া!" লাঞ্ছিত লাটবাহাদুর ফিরে এলেন, পারলেন না দোকানপাট খোলাতে।

* পাঞ্জাবে একটা লোকাচার আছে (এখনও আছে কি না জানি না) কেউ মারা গেলে, মৃতদেহ সাম্‌নে রেখে শোক প্রকাশ করবার জন্য লোক ভাড়া করে আনা হয়। আত্মীয়স্বজনের ক্রন্দনরোলে এই ভাড়াটিয়া শোকপ্রকাশকেরা তারস্বরে যোগ দিয়ে, বুক চাপ্‌ড়িয়ে, মৃত্যুঘোষণার কাজে লেগে যায়। এরই নাম 'সিয়াপা'। পাঞ্জাবের ছোটলাট-বাহাদুরকে পরিহাস করবার জন্যই লাহোরের অন্তঃপুরিকারা তার অনুকরণে কান্না জুড়ে বুক চাপ্‌ড়াতে শুরু ক'রলেন—মার্শাল-ল' জারী করবার আগের দিন দীর্ঘ পাঁচদিনব্যাপী হরতাল-রুদ্ধদ্বার দোকানপাট খোলবার চেষ্টায় স্যার মাইকেল ওডায়ার পুরাণো শহরের ভিতরে ঢুকতেই। অর্থাৎ বলা হোল—তাঁর প্রবেশটা রীতিমতো অমঙ্গল, মৃত্যুর আবির্ভাবের মতই শোকাবহ।

পর দিনই (১৫ই এপ্রিল) লাহোরে 'মার্শাল-ল' জারী হোল,—"ট্রিবিউন" আপিস থেকে কালীনাথকে ধরে নিয়ে গেল এসে মিলিটারী আর সি-আই-ডি পুলিশে; আমি নজরবন্দী রইলাম আপিসেই। সুরু হোল লাহোরে কর্ণেল ফ্র্যাঙ্ক জন্‌সনের জঙ্গী তাণ্ডব। গুজরাণ-ওয়ালায় হাওয়াই জাহাজ ক'রলে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমাবর্ষণ; কাসুরে চল্‌লো মেয়েদের উপর বেকসুর অত্যাচার, আর অমৃতসরের রাস্তায় বেয়নেটের আগায় মানুষকে হাঁটানো হোল বুক দিয়ে।

তার পর নেমে এলো ঘোর কৃষ্ণ যবনিকা—পাঞ্জাবের আর সারা ভারতবর্ষের মাঝখানে! সে-নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সেদিন কোথাও ছিল না এতটুকু আলোর রেখা। সেদিন সমস্ত দেশ—"মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে;" সেদিন "দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" সে-অন্ধকার ভেদ করে, সে-অবগুণ্ঠন সহসা ছিন্ন করে দিল,—জ্যোতির্ময় আলোক-রশ্মির তরবারি-লেখা—১৯১৯-এর ৩০শে মে।

সেদিন বাঙলার কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোল ধিক্কার;—দেশের পুঞ্জীভূত অপমানের বিষ নীলকণ্ঠের মতো আপন কণ্ঠে ধারণ করে, তিনি ইংরেজের হাতে-পরানো মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ধূলোয়; —তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর পাশে। তিনি লিখলেন বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে—

6, Dwarkanath Tagore Lane,
Calcutta, May 30, 1919.

YOUR EXCELLENCY,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to

a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting, what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have, in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain, and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency to relieve me of my title of my Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours Faithfully,
RABINDRANATH TAGORE

এ-চিঠির—আমার মনে হয়—বাঙ্‌লা তর্জ্জমা হয় না। "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকার তখনকার সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-ম'শায়ের অনুরোধে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে-অনুবাদ করেছিলেন, তা' পড়লেই দেখা যাবে,—এর মর্য্যাদা, এর বীর্য্য, এর কশা, এর জ্বালা থাকে না ভাষান্তরিত হলে। তবু রইলো তা' এখানে, কবির নিজের রচনা ব'লেই—

কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্ব্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপে বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোক-হনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন এ কথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্ম্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পাঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্ব্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্ম্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্য্যের সহিত আমাদের দুঃখ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্ত্তা পীড়িত পক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল; যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্ম্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম্ম-নিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র

করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্ত্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্ব্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এ-চিঠির আগের ইতিহাস একটু জানিয়ে রাখি এখানে। সবটা হয়তো জানা নেই সকলের।

ঠিক কার কাছ থেকে কবি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবরটা পেয়েছিলেন তা বলা কঠিন। পাঞ্জাব আর বাঙ্‌লার মধ্যে তখন চিঠি বা খবরের কাগজ চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল—কড়া সেন্সরশিপের পাহারায়। তাঁর ভাগ্নী, পঞ্চনদের অমিতবিক্রম নেতা পণ্ডিত রামভুজ দত্ত-চৌধুরী-জায়া, সরলা দেবী তাঁকে তাঁর স্বামীর বিপদের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সে-চিঠি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেঁাছয়নি। আমিও তাঁকে সে-সময় লাহোর থেকে একাধিক চিঠি লিখেছি,—একখানিও তিনি পান নি। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু খবর ঠিকই পেঁাছেছিল। ভাইসরয়কে চিঠি লেখবার আট দিন আগে, ২২শে মে—শান্তিনিকেতনে তখন নিদারুণ গ্রীষ্ম—তিনি একখানি চিঠিতে তাঁর একটি স্নেহাস্পদাকে* লিখছেন (মেয়েটি তখন সিমলা পাহাড়ে)—

"আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা ত পাঞ্জাবেই আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের

*রাণু অধিকারী, এখন লেডী রাণু মুখার্জ্জি।

খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।" [ভানুসিংহের পত্রাবলী]

তাঁর এই দুঃসহ মর্ম্মদাহের কথা কবি বলেছিলেন এক জায়গায়—অনেকদিন পরে। তাঁর নিজের কথাই দিচ্ছি তুলে—

"জানো, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপারের সময়, তখনও ভাল করে খবর পৌঁছয়নি। আমি বোধ হয় চৌধুরীদের [আশু-চৌধুরী প্রমথ-চৌধুরীদের কথাই যেন এখানে বলছেন মনে হয়] ওখান থেকে খবর পাই, ভাল করে মনে নেই। শুনে যে কি প্রবল কষ্ট অসহ্য কষ্ট হয়েছিল, তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল—এর কোনো উপায় নেই? কোনো প্রতিকার নেই? কোন উত্তর দিতে পারব না? কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয়, তা হ'লে জীবন ধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।" [মৈত্রেয়ী দেবী—"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"]

রাতের পর রাত কবি ঘুমুতে পারছেন না। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলেন ক'লকাতায়—২৭শে মে। এসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গেলেন, তাঁর প্রীতিভাজন কোনো একজন বিখ্যাত দেশনেতার কাছে। রবীন্দ্রনাথ ব'লছেন—"...তাকে বল্লুম যে, একটা প্রটেস্ট মিটিংয়ের ব্যবস্থা কর, আমিও বলবো, তোমরাও বলবে।" রাজী হলেন না তিনি; আরও কয়েকজনের কাছে গেলেন, রাজী হলেন না কেউ। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট তখনো চেপে বসে রয়েছে দেশের বুকের উপর,—কি জানি, কি হয়! ভয়ে মুহ্যমান সারা দেশ। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব তখন কবির সঙ্গেই ছিলেন; তিনি লিখেছেন—

"He tried to get up a public meeting of protest ; but no one was willing to take the chair." ['Rabindranath Tagore' by C. F. Andrews in "Voorslag," a quarterly journal published from Durban, South Africa, May—July, 1927].

রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি, তখন তিনি গান্ধিজীকে জানালেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবে যেতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধিজী রাজী হলেন না।*

---

* সরকারী নিষেধ ও বাধা, বিশেষভাবে 'মার্শাল ল'-এর ভয়াল ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে গান্ধিজী কেন তখন পাঞ্জাবে আসেননি, এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা

২৮শে মে, ২৯শে মে এই দুদিন গেল এই বৃথা চেষ্টায়। ২৮শে মে-র সকালে তিনি গেলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-ম'শায়ের কাছে। তাঁর এই বন্ধুর মতামতের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল চিরদিন। শেষে, ২৯শে রাত্রিতে, লিখলেন তাঁর চিঠি ভাইসরয়কে। কবি বলেছেন—"রাত চারটের সময় চিঠি শেষ ক'রে আমি শুতে যেতে পেরেছিলুম। কাউকে বলিনি এ বিষয়ে, রথীদেরও (অর্থাৎ তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ বা অপর আত্মীয়দেরও) নয়। জানি, এসব ব্যাপারে বেশি পরামর্শ কিছু নয়।

হয়েছে। পাঞ্জাব-হাঙ্গামার কংগ্রেসী-তদন্ত-কমিটির কাজে, ক'মাস বাদে, [অক্টোবর। ১৯১৯] গান্ধিজী লাহোরে আসবার পর, এ বিষয়ে তাঁর নিজের মুখ থেকে কিছু শোনবার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি তখন তাঁর কথা শুনে এই বুঝেছিলাম যে, তিনি প্রথমে সমস্ত বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে আবার পাঞ্জাবে আসবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হোল যে, ৬ই এপ্রিলে 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণার পর, যখন গুজরাটে ও পাঞ্জাবে হাঙ্গামা বাধলো, তখন তিনি, যথেষ্ট প্রস্তুতি বিনা, সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে আপামরসাধারণকে আহ্বান করবার ভুল বুঝতে পেরে, তাঁর সে-ভুল স্বীকার করেছেন—যে-ভুলের জন্য জনসাধারণের পক্ষেও একাধিক অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্যভাবে তাঁর সে ভুল—Himalayan miscalculation'—স্বীকারের পর, আবার পাঞ্জাবে এসে বা আসবার পথে অ্যারেষ্ট হওয়া, তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। আর, 'মার্শাল ল'-এর সময় পাঞ্জাবে যদি তাঁকে ঢুকতেও দিত, কিছুই করতে পারতেন না তিনি। তিনি এলে তাঁকে আটকেই রেখে দিত। কোনো কাজই হোত না তাতে; হয়তো বা তাঁর অ্যারেষ্টের খবরে দেশের অন্যত্র রক্তপাত হোত, যেমন কিছুদিন আগে হয়েছিল গুজরাটে, পাঞ্জাবে। অ্যাণ্ড্রুজ্ সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"Just before that letter [Rabindranath's letter surrendering his knighthood] was written [May 30, 1919], while I was with him in Calcutta, I had been staying with Mahatma Gandhi in Bombay, and I had seen with what agony he also had felt all that was happening, and with what difficulty he was prevented from going immediately into the Punjab in order to court arrest. Whether I did right or wrong, I do not know ; but I myself joined in trying to prevent him at that time from going into the Punjab. I felt that the time had not yet come. What I want to point out is this, that I saw, at that critical moment, the same independence of spirit, the same fearless courage, the same passionate hatred of tyrannical force, the same utter disregard of consequences, the same willingness to sacrifice life itself for duty, the same love and reverence for the fair name of India in both of them—no whit less strong in one than in the other. ['Gandhi And Tagore', "The Hindu" Madras, April 10, 1924.]

পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়। [মৈত্রেয়ী দেবী—"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"]

এতদিনে তাঁর মনের জ্বালা যেন একটু জুড়ালো। সেইদিনই তিনি লিখছেন রাণুকে—"ক'লকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি,—আমার ঐ 'ছার'-পদবীটা ফিরিয়ে নিতে।...আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।" অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে আমি শুনেছি, পরদিন ৩০শে মে সকালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে তাঁর চিঠিখানি দেখালেন, তখন তিনি সেটিকে একটু মোলায়েম ক'রে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ জানালে, তিনি সাহেবের দিকে এম্‌নি করে তাকিয়েছিলেন যা তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না কোনদিন,—"Such a look as I had never seen in the eyes of Gurudev before or after!"

ভয় আত্মীয়-বন্ধুদেরও ছিল,—আর ভয়ের কারণও ছিল যথেষ্ট। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব লিখে গিয়েছেন—মনে রাখতে হবে যে, তখন ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বলবৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, তিনি তাঁর এই চিঠির জন্য গ্রেপ্তার, সরাসরি-বিচার ও জেল-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক সেই সময়েই পাঞ্জাবে অনেকেই এর চেয়ে অনেক কম গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কাজের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত শাস্তি পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভয় পাননি। তিনি সে দুর্দিনে—"স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি"-রূপে "সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়", সারা দেশকে দিলেন "অভী"-মন্ত্র। তাঁকে শাস্তি দেবে কে?

> "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে,
> সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে"

কিন্তু ইংরেজ তাঁকে ক্ষমা করেনি। তিনি বলেছেন—"ওঁদের ওটা খুব অপমান লেগেছিলো। তারপর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে দেখলাম—ওরা সে কথা ভুলতে পারছে না। ইংরেজ রাজভক্ত জাত;—রাজাকে প্রত্যাখ্যান তাই অত আঘাত দিয়েছিল ওদের।" [মৈত্রেয়ী দেবী—"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"]

শুধু এদেশের ছোট ইংরেজ নয়,—যারা গায়ের জ্বালায় তাদের কাগজ *Englishman*-এ লিখেছিলো—

> "It will not make a ha'porth worth of difference. As if it mattered a brass farthing whether Sir Rabindranath Tagore approved of the Government's policy or not! As if it mattered to the reputation, the honour and the security of British rule and justice whether this Bengalee Poet remained a knight or a plain Babu!"

শুধু তারাই নয়,—ওদেশের বড় ইংরেজও বিচলিত হয়নি একটুকুও কম। ইংল্যাণ্ডের রাজকবি, কবির অনুরাগী বন্ধু, রবার্ট ব্রিজেসের রবীন্দ্রনাথকে লেখা একখানি চিঠি দেখেছি আমি। তিনিও ক্ষমা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথকে।* আর সেবার ১৯২০-তে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার ব্রিটিশ এম্ব্যাসী তাঁর পিছনে কি রকম গোয়েন্দা লাগিয়েছিল, লণ্ডনের বিখ্যাত "নেশন" পত্রিকায় হেনরী নেভিনসন্ তা' দিয়েছিলেন ফাঁস করে।

"জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি" শুধু যে তাঁর জীবনের এক পরম গৌরবকাহিনী তা' নয়, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্তে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পরাধীনতার বেদনা আর

* রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্ রবীন্দ্রনাথের রাজদত্ত উপাধি-বর্জ্জনে কতটা যে বিচলিত হয়েছিলেন, তার একটু আভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯২০-সনে রবীন্দ্রনাথ যখন অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন, তখন। সে-সভায় কিছু বলবার জন্য সভার উদ্যোক্তারা ব্রিজেস্‌কে অনুরোধ জানালে, তিনি সে-অনুরোধ রক্ষা করেননি। সেই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার একখানি নকল আমার কাছে আছে। সেবার য়ুরোপ থেকে ফেরবার পর, তাঁকে লেখা আরও কয়েকজন য়ুরোপীয় মনীষীর চিঠি নকল ক'রে আমার কাছে রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। আমি ব্রিজেসের সেই চিঠি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

". . . . and am sorry that I do not feel able to accept the invitation, which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on Friday . . . ."

"I am writing, especially as I never sent any answer to your several communications since the late disturbances in India. I began a long letter but I feared that you might misunderstand it even more than you could misinterpret my silence, and in England we could not at first rely on the Press reports of events."

অপমান সমস্ত দেশের হয়ে এমন করে কেউ আর অনুভব করেনি,—আর এমন করে কেউ তাকে ব্যর্থও পারেনি করতে।

কিন্তু শুধু উপাধি বর্জন করেই কবি ক্ষান্ত হননি,—পাঞ্জাব-ব্যাপারে তাঁর যা করণীয় তা করে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করেননি তিনি। তিনি তা' নিয়ে য়ুরোপে ও আমেরিকায় তাঁর বহু মনীষী বন্ধুকে চিঠি লিখেছেন বারবার: তাঁদের জানিয়েছেন ইংরেজের অনাচার অত্যাচার,—তাদের হাতে তাঁর স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা। আমার এডিটর কালীনাথ রায় ম'শায়ের কারামুক্তির জন্য তিনি যা করেছিলেন, তা চিরদিন কালীবাবু সকৃতজ্ঞ স্মরণে রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পরলোকগত অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়-ম'শায় আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কালীবাবুর জন্য কর্তৃপদবাচ্যের কাউকে বাকী রাখেননি চিঠি লিখতে। আমাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি সাক্ষ্য দিচ্ছে তার—

শান্তিনিকেতন
২৭।৭।১৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার চিঠি কদিন হোল পেয়েছি।

আজকের কাগজে দেখলাম ট্রিবিয়ুন আবার বেরিয়েছে—তোমার হাতে। খুসী হয়েছি কিন্তু শঙ্কা রয়েছে মনে। কর্তৃপক্ষদের কুটিল ভ্রূকুটি কাটেনি এখনো। সন্তর্পণে তুমি এই ভার বহন কর—এই আমার কামনা।

জেলে কালীনাথ রায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ সংবাদে উদ্বিগ্ন রয়েছি। তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করে মণ্টেগু ও লর্ড সিংহ দুজনকেই লিখেছি। ফলাফলের অপেক্ষা ছাড়া আর কি করবার আছে? ভরসা বেশি রেখো না।

শঙ্করণ নায়ার কি করলেন? তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে হয়তো ভালো হোত। তোমার বোধ হয় এখন সিমলা যাওয়ার সুবিধা হবে না। এণ্ড্রুজ কয়েকদিন পরে যাবেন। তার পর লাহোরে। তোমাকে জানিয়েছেন বোধ হয়। তাঁর কাছে সব খবর পাবে। 'সাহেব' খেপে আছে। ও জানে, পাঞ্জাবের কালিমা ইংরেজের কোনদিন মুছবে না।

আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিন মাস বন্ধ থাকবার পর কাগজ বের করবার অনুমতি পেয়ে, আমি সত্যিই আর যেতে পারিনি সিমলায়। স্যর শঙ্করণ নায়ারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন—কালীনাথের দুর্দ্দিনের বন্ধু, লাহোরের উকীল সুধীর মুখোপাধ্যায়-ম'শায়। যখন লাহোর চীফ কোর্টের কোনো উকীল, কোনো ব্যারিষ্টার কালীবাবুর পক্ষ সমর্থন করতে সাহস পাননি; যখন মার্শাল-ল' অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর কর্ণেল ফ্র্যাঙ্ক জন্‌সনের হুকুমে কলকাতার বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেবকে পাঞ্জাবের দরজা থেকে ফিরে আসতে হোলো,—তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হোল না কালীবাবুর মামলা চালাবার জন্য,—তখন একমাত্র সুধীর-বাবুই নির্ভয়ে সে-ভার নিয়ে ডিফেন্সের সুব্যবস্থা করেছিলেন। দণ্ড রদ কিম্বা হ্রাসের জন্য বড়লাটের কাছে আবেদন নিয়ে যখন তিনি শঙ্করণ নায়ারের কাছে পরামর্শের জন্য যান, তখন স্যর শঙ্করণ তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি দেখিয়ে বলেন, 'ভাগ্যিস্, চেমস্-ফোর্ড জানেন না যে, টেগোর এ-ব্যাপারে সুপারিশ তদ্‌বির করছেন!' যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত কালীনাথের কারাদণ্ডকাল বড়লাট কমিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তিনি ছাড়া পেলেন কিছুদিন পরে।

এর ক'মাস পরে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গেলেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়েই তিনি সকলের আগে গেলেন ইণ্ডিয়া অফিসে—মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সঙ্গে দেখা করতে। ইতিমধ্যে হাণ্টার কমিশনের পাঞ্জাব-হাঙ্গামা তদন্তের রিপোর্ট বেরিয়েছে। রথীন্দ্রনাথের ডায়েরীতে মণ্টেগুর সঙ্গে তাঁর পিতার পাঞ্জাব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার যে-বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে, তাতে দেখেছি তিনি সেক্রেটারী অফ স্টেটকে বলছেন যে, ভারতের লোক ডায়ারকে শাস্তি দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়; তারা জানতে চায় যে, অমৃতসরে তার অমানুষিক অত্যাচার মানবধর্ম্মনীতির বিরোধী হয়েছে, ইংল্যাণ্ড তা' স্বীকার করে কি না। পার্লামেণ্টে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বিচারকালে যে সমগ্র ব্রিটিশ জাতির পরীক্ষা, সে-কথাটাই স্পষ্ট করে জানালেন রবীন্দ্রনাথ। লর্ড সিংহের সঙ্গে আলোচনাকালে কবি ও তিনি একমত হলেন যে, পাঞ্জাবের লোকে মার্শাল ল'র অত্যাচার অনাচার যেভাবে মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলো,

বাংলায় তা' কখনই সম্ভব হোত না,—বাঙালী সহ্য করতো না অমন ভাবে মনুষ্যত্বের অপমান। সে-সময় বিলাত থেকে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লিখেছিলেন "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায়—

"পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। আমরা রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলিব না। আমরা শাসনকর্ত্তাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ধর্ম্মনীতির দিক হইতে এই ব্যাপারের বিচারকালে আমাদের স্বদেশীয়দের চরিত্র আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। যে ঘটনা কেবল দুঃখকর, তাহার দ্বারা কাহারও অবমাননা হয় না; কিন্তু মানুষের প্রতি পশুর মত আচরণ করা সম্ভবপর হইলে, সেই লজ্জা দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সেই লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। ইহাই বুঝিতেছি যে, আমাদের চরিত্রের এমন গভীরতর হীনতা ঘটিয়াছে যে, আমাদের প্রতি শুদ্ধমাত্র দুঃখ প্রয়োগ করা নহে, আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান করা সহজসাধ্য হইয়াছে, ইহা আমাদের নিজেদের আন্তরিক দুর্গতির কারণ।

" 'পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না'—পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষেব বাণী শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না, তখন সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে হইবে।......নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা;—কেন না কর্ত্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই" ["শান্তিনিকেতন", ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২৭]।

রথীন্দ্রনাথের ডায়েরীতেই দেখেছি, লণ্ডনে এক সংবর্দ্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ, টোরী পার্টির বিশিষ্ট নেতা ভাইকাউণ্ট সেসিলের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই তাঁকে একান্তে নিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবের অনাচারের কথা জানাচ্ছেন; অক্সফোর্ডের বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যরেকে বলছেন, ইংলণ্ডের মনীষীদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, পাঞ্জাবে তাঁদের স্বদেশীয়দের আচরণ ধর্ম্মবিগর্হিত হয়েছে, তাঁদের তরফ থেকে একটা প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রচার করা হয় যেন খবরের কাগজে। বিলাতে চুপ করে বসে নেই কবি।

তার পর যখন পার্লামেণ্টে হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে হাউস অফ লর্ডসে বিতর্কের অবসান হোল জেনারেল ডায়ারের সমর্থনে,

তখন রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত রইলো না আর। তিনি লিখলেন অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে ঃ--

London, July 22nd, 1920.

"The result of the Dyer debates in both Houses of Parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling classes of this country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their Government, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our governors are chosen.

"The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their newspapers is ugly in its frightfulness. The feeling of humiliation about our position under the Anglo-Indian domination had been growing stronger every day for the last fifty years or more ; but the one consolation we had was our faith in the love of justice in the English people, whose soul had not been poisoned by that fatal dose of power which could only be available in a Dependency where the manhood of the entire population had been crushed down into helplessness.

"Yet the poison has gone further than we expected, and it has attacked the vital organs of the British nation. I feel that our appeal to their higher nature will meet with less and less response every day. I only hope that our countrymen will not lose heart at this, but employ all their energies in the service of their country with a spirit of indomitable courage and determination.

"The late events have conclusively proved that our true salvation lies in our own hands ; that a nation's greatness can never find its foundation on half-hearted concessions of contemptuous niggardliness.

"It is the sign of a feeble character to seek for a short-cut to fulfilment through the favour of those whose interest lies in keeping it barred—the one path to fulfilment is the difficult path of suffering and self-sacrifice.

All great boons come to us through the power of the immortal spirit we have within us, and that spirit only proves itself by its defiance of danger and loss." ["Letters to a Friend." Edited by C. F. Andrews. Allen & Unwin, London 1928.]

"ভারতের প্রতি এ-দেশের শাসক সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে,—পার্লামেণ্টের দুটি কাম্‌রাতেই [জেনারেল] ডায়ারসংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমূলে। এর থেকে যে-কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা' এই যে, এ-দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্ত্তারা নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আম্‌লারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনোরকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

"তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে-রকম নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিধ্বনি যেভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে, তা অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দাসত্বাধীনে আমাদের অবস্থায় লজ্জা ও অপমানের অনুভূতি, বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল, প্রতিদিন আমাদের উত্তরোত্তর অভিভূত ক'রে ফেলেছে;—কিন্তু তবুও আমাদের একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইংরেজজাতির ন্যায়ানুরাগের উপর আমাদের আস্থা। আমরা ভেবেছি যে, সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীনস্থ দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত ক'রলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ-সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত ক'রতে পারেনি।

"কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবিনি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে; ব্রিটিশ জাতির নাড়ীতে ঘুণ ধরেছে; তার মজ্জা এই দারুণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জ্জরিত হতে চলেছে। আমি অনুভব ক'রছি যে, ওদের মহদানুভূতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশঃ ক্ষীণতর সাড়া পাবে। কিন্তু আমার একান্ত আশা এই যে, আমার স্বদেশবাসিগণ এতে নিরাশ বা হতাশ হবেন না, অপিচ দেশের সেবায় তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও সামর্থ্য অদম্য সংকল্পে ও সাহসে উৎসর্গ করবেন।

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের সত্যকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে; কোনো জাতিরই প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য কারও তাচ্ছিল্য-প্রণোদিত বা অবজ্ঞা-সঞ্জাত কার্পণ্যের মুষ্টিভিক্ষার উপর গ'ড়ে তোলা চলে না। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণের নির্দ্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর ক'রে জাতীয় সাধনার সুলভ সিদ্ধির সন্ধান, আমাদের চরিত্রবলের দীনতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখবরণের দ্বারাই

আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান;—তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্তর্নিহিত অমোঘ অমরাত্মার সক্রিয় শক্তি-বিকাশেই সম্ভব হয় মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ; এবং সেই শক্তির উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র বিপদ ও ক্ষতির উপেক্ষামূলেই।" [গ্রন্থকারের তর্জমা]

সেই একই তেজোদ্দীপ্ত বাণী, যা ভাষা পেয়েছিলো বড়লাটের কাছে উপাধি পরিত্যাগ-পত্রে, তারই অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখি এখানে আবার।

এই চিঠির ক'দিন পরে—১৩ই অগাস্ট্—আবার লিখছেন ইংরেজ-বন্ধু অ্যাণ্ড্রুজকে,—এবার প্যারী থেকে—

"Our stay in England has been wasted. Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of an arrogant spirit of contempt and callousness about India have deeply grieved me, and it was with a feeling of relief that I left England."

"আমাদের বিলাতে থাকাটা সমস্তই বৃথা হয়েছে। আপনাদের পার্লামেণ্টে পাঞ্জাবের 'ডায়ারিজম্' সম্পর্কে আলোচনা-বিতর্কে এবং ভারতের সম্বন্ধে ঘৃণা ও ঔদাসীন্যের বহু দৃষ্টান্তের পরিচয়ে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। এই জন্য, ইংল্যাণ্ড ছেড়েই যেন স্বস্তি লাভ করেছি।"

কিন্তু এই কথাই তাঁর শেষ কথা নয়। কবি এবার এলেন একেবারে আসল কথাটিতে:—যেখানে সত্যিকার গলদ ফিরে এলেন সেখানে। ঐ প্যারী থেকেই লিখছেন অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯২০)—

"Let us forget the Punjab affairs—but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order. Do not mind the waves of the sea, but mind the leaks in your vessel."

"পাঞ্জাবের ঘটনা, আসুন, আমরা ভুলে যাই; কিন্তু একথা ভোলা কখনও চলবে না যে, যতদিন না আমরা নিজেদের ঘর ভাল ক'রে বাঁধতে পারবো, ততদিন আমাদের এই নিদারুণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতেই হবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকালে কোনো কাজ হবে না, নিজের নৌকার ছিদ্রগুলির দিকে মন দেওয়াই দরকার আগে!"।

সেই একই কথা, যা' সারাজীবন বলে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীদের—"নিজেদের দিকে তাকাও, আপন ঘর সামলাও,—চলো আত্মোপলব্ধি ও আত্মসংস্কৃতির পথে।"

স্বদেশের অপমান-বেদনা, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, তীব্র অনুভূতিতে, মর্মজ্বালায় রবীন্দ্রনাথকে বারবার যেমন ক্ষুব্ধ করেছে; প্রত্যেক সঙ্কট-কালে তিনি যেভাবে তাঁর স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার তুলনা আর কোনো দেশের আর কোনো কবির জীবনে পাওয়া যায় কি না জানি না; কিন্তু তিনি আপন দেশের কোনো অপমানকে, মনুষ্যত্বের কোনো অবমাননাকেই কোনোদিন চিরস্মরণীয় করে রাখতে স্বীকৃত হননি। তাই যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়, তখন তিনি তাতে সায় দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন—

> "কোনও চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ।...যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্য্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাখিব? আমাদের রাজপুরুষেরা কাণপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নাই?" ["শান্তিনিকেতন", ২য় বর্ষ. ১ম সংখ্যা]।

এর চেয়েও বড় কথা বলেছিলেন কবি, বম্বাইয়ে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায়, সে-সভার অধিনায়ক মহম্মদ আলি জিন্নার আমন্ত্রণে, যে-বাণী তিনি পাঠান, তাতে। [১৩ই এপ্রিল। ১৯২০] সে-বাণীটি পুরানো খবরের কাগজের পীতরাগ পাতা থেকে উদ্ধারের যোগ্য সর্ব্বতোভাবেই। তাই আমার এ-প্রবন্ধের উপসংহার করি সেটি দিয়ে—

> "A great crime has been done in the name of law in the Punjab. Such terrible eruptions of evil leave their legacy in the wreckage of ideals behind them. What happened in Jallianwalla Bagh has itself a monstrous progeny of a monstrous war, which for four years had been defiling God's world with fire and poison, physical and moral. The immensity of the sin, through which humanity had waded across its blood-red length of agony, has bred callousness in the minds of those who

have power in their hands, with no check of sympathy within, or fear of resistance without. The cowardliness of the powerful, who owned no shame in using their machines of frightfulness upon the unarmed and unwarned villagers, and inflicting unspeakable humiliations on their fellow-beings behind the screen of an indecent mockery of justice—not feeling for a moment that it was the meanest form of insult to their own manhood—has become only possible through the opportunity which the late war had given to men for constantly outraging their own higher natures, trampling truth and honour under foot. This disruption of the basis of civilisation will continue to produce a series of moral earthquakes, and men will have to be ready for still further sufferings. That the balance will take a long time to be restored is clearly seen by the suicidal ferocity of vengefulness ominously tinging red the atmosphere of the peace deliberations.

"But we have no place in these orgies of triumphant powers, rending the world to bits according to their own purposes. What most concerns us is to know, that moral degradation not only pursues people inflicting indignities upon the helpless, but also their victims. The dastardliness of cruel injustice, confident of its impunity, is ugly and mean. But the fear and impotent anger, which are apt to breed upon the minds of the weak, are no less abject.

"Brothers, when physical force, in its arrogant faith in itself, tries to crush the spirit of man, then comes the time for man to assert that his soul is indomitable. We shall refuse to own moral defeat by cherishing in our hearts ıoul dreams of retaliation. The time has come for the victims to be the victors in the field of righteousness.

"When brother spills the blood of brother on the ground and exults in his sin, giving it a high-sounding name ; when he tries to keep the bloodstain fresh on the soil, as a memorial of his anger, then God in shame

conceals it under His green grass and beneath the sweet purity of his flowers. We who have witnessed the wholesale slaughter of the innocent in our neighbourhood, let us accept God's own office, and cover the bloodstains of iniquity with our prayer:—

"Rudra yat te dakshinam mukham tena mam pahi nityam."
"With Thy graciousness, O Terrible, for ever save us."

"For the true grace comes from the Terrible, who can save our souls from the fear of suffering and death in the midst of terror, and from vindictiveness in defiance of injury. Let us take our lessons from His hand, even when the smart of the pain and insult is still fresh—the lesson that all meanness, cruelty and untruth are for obscurity and oblivion, and only the Noble and True are for Eternity. Let those who wish, try to burden the minds of the future with stones, carrying the black memory of their anger, but let us bequeath to the generations to come only those memorials which we can revere. Let us be grateful to our forefathers, who left us the image of our Buddha, who conquered self, preached forgiveness, and spread his love far and wide in time and space".

"আইন ও শৃঙখলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে একটি মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো পাপের এই রকম ভীষণ আকস্মিক প্রকাশ তাদের পশ্চাতে রেখে যায়—আদর্শের ভগ্নস্তূপের ও ভস্মাবশেষের আবর্জ্জনা। চার বছর ধ'রে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগৎকে আগুনে দগ্ধ ও বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসুরিক ঔরস্য হোলো এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। যে দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তলাঞ্ছিত দীর্ঘ পথে মানবতা চলেছে আজ পা টেনে টেনে, তারই বিপুল পাপভার, যাদের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা আছে, তাদের মনে জাগিয়েছে অনমনীয় কাঠিন্য আর ঔদাসীন্য। সে-মনে না আছে এতটুকু দরদের বাধা বা বাইরে থেকে বাধা পাওয়ার একটুও ভয়। এই যে ক্ষমতাবানের কাপুরুষতা, তা এতটুকু লজ্জা বোধ করেনি অস্ত্রহীন ও অসতর্কিত গ্রামবাসীদের উপর মারণাস্ত্রচালনার নিষ্ঠুরতায়; কিম্বা, কুৎসিত বিচার-প্রহসনের যবনিকার অন্তরালে, অকথ্য অবমাননা-প্রয়োগে।

এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অনুভূতিতে এ-কথা জাগেনি যে, এটা তাদেরি মনুষ্যত্বের জঘন্য অপমান। গত যুদ্ধে মানুষ সত্য ও সম্ভ্রম-বোধকে যে-ভাবে পদদলিত ক'রে আপন স্বভাবের মহত্তর প্রকাশকে নিয়ত লাঞ্ছিত করেছে, তাতেই সম্ভব হয়েছে এই কাপুরুষতা। ভূকম্পের পর ভূকম্প সৃষ্টি ক'রে যাবে সভ্যতা-সৌধের এই সমূল উৎপাটন;—মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরও দুঃখভোগের জন্য। আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি [য়ুরোপের পীস্-কন্ফারেন্সে] শান্তি-আলোচনার আবহাওয়াকে যে-ভাবে আজ কলুষিত ক'রে তুল্ছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভারসাম্য ফিরে আসতে লাগবে বহুদিন। জয়মদমত্ত শক্তিপুঞ্জের এই ভৈরবী-চক্রে আমাদের কোনো স্থান নেই। তারা তাদের অভিপ্রায়মতো দুনিয়াটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্ছে। আমাদের যে-কথাটা জানা প্রয়োজন, সে হচ্ছে এই যে, যারা নিঃসহায়দের অপমান-লাঞ্ছনা করে, নৈতিক অধঃপতন শুধু তাদেরই ঘটে না; যাদের উপর বর্ষিত হয় সে-অপমান, তাদেরও ঘটে সেই অধঃপতন। নিষ্ঠুর অবিচার যখন নিঃসন্দেহে জানে যে, সে পাবে নিশ্চিত অব্যাহতি, তখন তার কাপুরুষতা সত্যই কুৎসিত ও নীচ। কিন্তু এ-অবস্থায়, দুর্ব্বলের মনে যে ভয় ও নিবীর্য্য ক্রোধের সঞ্চার-সম্ভাবনা রয়েছে, তা সেই কাপুরুষতার চেয়ে কম হেয় নয়।

"ভ্রাতৃগণ, পশু-শক্তি যখন নিজের দম্ভ-বিশ্বাসে, মানুষের আত্মাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করে, তখনই মানুষের সময় আসে, তার আত্মা যে অজেয়, সে-কথা জোর-গলায় জাহির করবার। আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসা-গ্রহণের কুশ্রী স্বপ্ন পোষণ ক'রে, আমরা কিছুতেই স্বীকার করবো না নৈতিক পরাজয়। সময় এসেছে, যখন যারা বিজিত, ন্যায়ের ক্ষেত্রে তারাই হবে বিজয়ী।

"ভাই যখন মাটিতে ভাইয়ের রক্ত ঝরিয়ে, তার সে-পাপকে মস্ত বড় একটা নাম দিয়ে, উল্লাস প্রকাশ করে; মাটির বুকে সেই রক্তের দাগকে যখন সে চায় তাজা রাখতে, তার ক্রোধের স্মরণস্তম্ভরূপে,—তখন বিধাতা লজ্জায় ঢেকে দেন সে কলুষ-চিহ্ন, তাঁর শ্যামল শষ্পের আস্তরণ বিছিয়ে, তাঁর পুষ্পের অকলঙ্ক সুমধুর শুভ্রতায়। আমরা যারা আমাদেরি দেশে নিরপরাধ মানুষের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখেছি,—আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি ঈশ্বরের সেই আপন কাজ;—যেন ঢেকে দিতে পারি পাপের রক্তচিহ্ন আমাদের এই প্রার্থনা দিয়ে—

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্!"

'হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করো।'

"কেন না, সত্যকার যে প্রসন্ন করুণা তা আসে রুদ্রের কাছে থেকেই। তিনিই পারেন, দুঃখভয় ও মৃত্যুভয়ের বিভীষিকা থেকে আমাদের

বাঁচাতে; তিনিই পারেন, সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ ক'রে, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বাঁচাতে। আসুন, বেদনা ও অপমানের মর্ম্মজ্বালার তীব্র অনুভূতির মধ্যেই, তাঁর হাত থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে,—সমস্ত ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা এবং অসত্য যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন রইবে শুধু চিরন্তন হ'য়ে—যা মহৎ, যা সত্য। যারা তাই চায়, তারা তাদের ক্রোধের নিকষকৃষ্ণ স্মৃতির পাষাণশিলায় ভারাক্রান্ত ক'রে তুলুক ভবিষ্যৎ কালের অন্তর: কিন্তু আমরা যেন, যারা অনাগত যুগে আস্‌বে,—আমাদের সেই ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রেখে যেতে পারি শুধু সেই স্মৃতিস্তম্ভ, যাতে আমরা পারবো দিতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য;—আমরা যেন পারি আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রতে, যাঁরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি,—যিনি জয় করেছিলেন অহংকে, যিনি প্রচার করেছিলেন ক্ষমাধর্ম্ম, যিনি দিগ্‌দিগন্তে, দেশে-কালে বিতরণ করেছিলেন তাঁর মৈত্রী, তাঁর প্রেম!" [গ্রন্থকারের তর্জ্জমা]

এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের বাণী, গান্ধিজীর জীবনবাণী,—ভারতের শাশ্বতবাণী।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

পাঞ্জাবে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ঐতিহাসিক। কিন্তু অনেকের বোধ হয় জানা নেই যে, রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধিজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কি দ্বিধা বা আশঙ্কা ছিল। সে-সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত তিনি পাঞ্জাবে হাঙ্গামা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধিজীকে একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। সেই চিঠিখানি এইখানে দেওয়া হোল।

Santiniketan
April 10, 1919

DEAR MAHATMAJI,

Power in all its forms is irrational, it is like the horse that drags the carriage blindfolded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself ; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes temptation.

I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustice leading to violence and insult to vengefulness. Unfortunately such a force has already been started, and either through panic or through wrath our authorities have shown us their claws whose sure effect is to drive some of us into the secret path of resentment and others into utter demoralisation.

In this crisis you, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror-stricken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come,—

"akkodhena jine kodham asadhum sadhuna jine",—

Conquer anger by the power of non-anger and evil by the power of good.

This power of good must prove its truth and strength by its fearlessness, by its refusal to accept any imposition which depends for its success upon its power to produce frightfulness and is not ashamed to use its machines of destruction to terrorise a population completely disarmed. We must know that moral conquest does not consist in success, that failure does not deprive it of its dignity and worth. Those who believe in spiritual life know that to stand against wrong which has overwhelming material power behind it is victory itself ; it is the victory of the active faith in the ideal in the teeth of evident defeat.

I have always felt, and said accordingly, that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it. And India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule her by their right of conquest. She must willingly accept her penance of suffering,—the suffering which is the crown of the great. Armed with her utter faith in goodness she must stand unabashed before the arrogance that scoffs at the power of spirit.

And you have come to your motherland in the time of her need to remind her of her mission, to lead her in the true path of conquest, to purge her present-day politics of its feebleness which imagines that it has gained its purpose when it struts in the borrowed feathers of diplomatic dishonesty.

This is why I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into your marching line, that martyrdom for the cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into the self-deception that hides itself behind sacred names. . .

Yours sincerely,
RABINDRANATH TAGORE

এই চিঠির সঙ্গে গান্ধিজীর "Himalayan miscalculation"-এর স্বীকৃতি স্মরণীয় ও অনুধাবনযোগ্য।

অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

১৩৫৫ শারদীয়া "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংযোজনী

অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

বড়লাট চেম্‌সফোর্ডকে লেখা কবির চিঠিখানি প্রকাশিত হ'লে পর বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে কিভাবে তা' অভিভূত করেছিলো, তা জানা যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-ম'শায়ের মৃত্যুর পর "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায়, [২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে-প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে। সমাজপতি-ম'শায় লিখেছিলেন—

"লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে 'এসিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। স্বদেশী-যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ১৩২১ সালে, পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর—হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

"রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েকদিন পূর্ব্বে **'নাইট'**-উপাধি বর্জ্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার [১৭ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩২৬] তাঁহার পদত্যাগপত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্তপত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান,—'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে [১৯শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩২৬] রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহার মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের

পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল,—দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল"।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-মশায়ের এই অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে যখন তুলনা করি, আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের উদাসীন মনোভাব, তখন সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র অমৃতসরে, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে, কংগ্রেসমণ্ডে রবীন্দ্রনাথের এই "ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা"-প্রসঙ্গে একটি কথাও শুনিনি কারুর মুখে! পাঞ্জাবে ওডায়ারী ও ডায়ারী বর্ব্বরতার, ইংরেজের অমানুষিকতার তীব্র প্রতিবাদে সভামণ্ডপ কাঁপিয়ে বক্তৃতা হোলো সমানে,—কিন্তু যেদিন সমগ্র দেশের আতঙ্ক-বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বাণী দিয়েছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, সেদিনের কথা একবারও কেউ বল্‌লে না! তাঁর সে-চিঠির এতটুকু উল্লেখও কেউ করলে না! কংগ্রেস থেকে একটা রেজোল্যুশন পাশ ক'রে যাতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশাত্মবোধের এই স-বীর্য্য প্রকাশকে, তাঁর স্বদেশবাসীর,—বিশেষভাবে পাঞ্জাবের,—পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়,—সে-চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনাটা যা ঘটেছিল তা এখানে ব'লে রাখা দরকার মনে করি। ইতিপূর্ব্বে তা' কোথাও বলবার সুযোগ পাইনি, পরেও আর পাব কি না জানি না।

অমৃতসরে যখন দেখ্‌লাম, কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষদের তরফ থেকে যে-সব রেজোল্যুশন সব্‌জেক্টস্‌ কমিটির সাম্‌নে উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-ত্যাগের নামগন্ধ কোথাও নেই, তখন আমি, আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের পর, সেই রকম একটি প্রস্তাবের খস্‌ড়া তৈরী ক'রে প্রেসিডেন্ট মোতিলালজীর কাছে কথা পাড়তেই তিনি বল্‌লেন—"You move it in the Subjects Committee".

আমি সব্‌জেক্টস্‌ কমিটির মেম্বার ছিলাট বটে, কিন্তু এ-রকম একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কংগ্রেসে পেশ করবার মতো শক্তি বা পদমর্য্যাদা দু'য়েরই আমার অভাব অনুভব ক'রে, আমি সকলের আগে ধরলাম

জিতেন বাঁড়ুয্যে-ম'শায়কে। তিনি প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ ক'রে, পরে, —ঠিক আধঘণ্টা পরেই,—কেন জানি না,—পিছিয়ে গেলেন। তখন আমি চিত্তরঞ্জন দাশ-ম'শায়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বলেন—"দেখ, আমার মনে হয়, বেঙ্গল ডেলিগেট কেউ এ-রকম প্রস্তাব না এনে, পাঞ্জাবের কাউকে দিয়ে এটা আনালে ভাল হয়।" আমি তখন ধরলাম লালা মনোহরলালকে, —যিনি ছিলেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির প্রথম মিণ্টো প্রফেসর অফ ইকনমিকস্, পরে হন পাঞ্জাবের শিক্ষাসচিব ও রাজস্ব-সচিব স্যর মনোহরলাল। "ট্রিবিউন" কাগজের একজন ট্রাষ্টী ব'লে, মার্শাল ল'-র সময়ে তাঁর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। তিনি আমাকে ব'ল্লেন— "You must have a passionate speaker to sponsor a motion like this. I don't feel equal to it! অনেক ব'লেও আমি মনোহরলালকে রাজী করাতে পারলাম না। শেষে ইন্দুভূষণ সেন (ক'লকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পরলোকগত আই-বি-সেন) মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সৈয়দ হোসেন সাহেবকে ধরলাম। তিনি অবশ্য পাঞ্জাবী ছিলেন না,—কিন্তু সুবক্তা ছিলেন। সৈয়দ সাহেবকে বলামাত্রই তিনি সম্মত হলেন। বল্লেন—"It will be an honour!" আর তখনি, আমি রেজোল্যুশনটার যে-খস্ড়া করেছিলাম, তার দুটো একটা কথা বদ্লিয়ে, নীচে নাম সই ক'রে দিলেন। ঠিক হোল যে, সৈয়দ হোসেন প্রস্তাবটি পেশ করবার পর রঙ্গ আয়ার সেটি সমর্থন করবেন। বর্ত্তমানে* মিশরে স্বাধীন ভারতের রাজদূত তখন মোতিলালজীর "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" কাগজের এডিটর,—আর রঙ্গ আয়ার তাঁর সহকারী এলাহাবাদে।

প্রস্তাবের খসড়া যথারীতি মোতিলালজীর সাম্নে নিয়ে ধরলাম। তখন সবজেক্টস্ কমিটির মিটিং চল্ছে। তিনি কাগজখানিকে আড়-চোখে একবার দেখে, তাঁর চশ্মার খাপ্টা চাপা দিয়ে সেটি রেখে দিলেন এক পাশে। ভাবলাম, যথাসময়ে সৈয়দ হোসেনের ডাক পড়বে। কিন্তু ডাক আর পড়লো না—দু'দুবার স্মারক 'স্লিপ্ পাঠানো সত্ত্বেও! শেষে জহরলালের খোঁজ করলাম। ছট্ফটে মানুষ; চুপ্টি করে এক

* এই প্রবন্ধ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে লিখিত হয়।

জায়গায় বসে থাকবার লোক নন। প্যাণ্ডালের বাইরে পাক্‌ড়াও ক'রলাম তাঁকে। তিনি গিয়ে 'পাপা'-র কানে কানে দু'একটা কথা কি ব'লতেই লক্ষ্য ক'রলাম, পণ্ডিত্‌জীর,—তখন আমরা মোতিলাল নেহরুকেই 'পণ্ডিত্‌জী' ব'লতাম,—ভুরুটা কুঁচ্‌কে উঠ্‌লো। ব্যাপার বুঝলাম না কিছুই। অনেক রাত্রিতে সব্‌জেক্টস্‌ কমিটির মিটিং যখন ভাঙ্গলো,—ছুটে গেলাম তখন পণ্ডিতজীর কাছে। তিনি শুধু বল্লেন—"Wait"! ভাবলাম কাল হয়তো প্রস্তাবটা উপস্থিত করবেন কমিটিতে। কিন্তু সে 'কাল' আর এলো না। কেন এলো না সে-রহস্য আমার কাছে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন সৈয়দ হোসেন,—কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার ক'দিন পরেই যখন গান্ধিজী তাঁকে বিশেষ জরুরী একটি কাজে এলাহাবাদ থেকে লাহোরে ডেকে পাঠান। আলি-ভাইরা তখন ছিলেন সেখানে গান্ধিজীর কাছে।

সে কথা থাক। শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে, পাঞ্জাব-ব্যাপারে বড়লাটের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোনো প্রস্তাবই পেশ বা পাশ হোলো না। অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পে এ নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ যে একটা মস্ত কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে—দু'একজন ছাড়া—এ ধারণার কোন পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম ব'লে মনে পড়ে না। বাংলার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, অখিল চন্দ্র দত্ত কাউকেই বলতে বাকী রাখিনি। তাঁদের মধ্যে যে কেউ একজন সব্‌জেক্টস্‌ কমিটিতে একবার উঠে দাঁড়ালেই হয়ে যেত। অন্য প্রদেশের নেতাদের মধ্যেও কাউকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম। তিনি কোনো উৎসাহই প্রকাশ করেননি। মডারেট নেতাদের মধ্যে তিনিই সেবার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন—আর সকলে বয়কট করেছিলেন। আর অবশ্য ছিলেন মালবীয়াজী। তাঁকে বলাতে তিনি বলেছিলেন—'To be put from the Chair' রেজোল্যুশনগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন আমার প্রস্তাবটা। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্য্যন্ত তার স্থান হয়নি। পরে মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবকে এ-সব কথা আমি জানানোতে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"তুমি আমাকে বল্‌লে না কেন?" আমার ভুল হয়েছিল।

গান্ধিজীকে বলবার সুযোগ পাইনি। তিনি তখন টিলক-মহারাজের

সঙ্গে 'কো-অপারেশান' বনাম 'রেস্‌পন্সিভ্‌ কো-অপারেশান'-দ্বন্দ্বে ব্যস্ত। তা' ছাড়া, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ-সব করতে হয়েছিলো আমাকে। আমার কাগজের কাজও ছিল অনেক। সব্‌জেক্টস্‌ কমিটিতে একটা রেজোল্যুশনের কথা "ট্রিবিউন"-এ আগে থেকেই বেরিয়ে যাওয়াতে মোতিলালজী ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসে, অবশ্য কারুর নাম না করে, এ নিয়ে খুব তিরস্কার করেছিলেন সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের। কংগ্রেস থেকে আমাদের বের করে দেবেন ব'লে শাসিয়েছিলেন। কেন জানিনা সন্দেহ করেছিলেন যে আমিই এ-কাজ করেছি! পরদিন যখন পাঞ্জাবের বাইরের কাগজ সব অমৃতসরে এসে পেঁছিলো, তখন দেখা গেল যে, সে-খবর তাতেও বেরিয়েছে। আসলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসই ব্যাপারটা ঐভাবে, নিজেদের নাম চেপে, ফাঁস করে দিয়েছিল। যা হোক্‌ এ নিয়ে একটা দিন আমাকে ভারি ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আর, মোতিলালজী এত চটেছিলেন যে, তাঁকে সৈয়দ হোসেনের নামাঙ্কিত রেজ্যোল্যুশন নিয়ে সেদিন খুব বেশি পীড়াপীড়ি করবার সাহস হয়নি আমার। আর করলেও যে কোন ফল হোত না,—তা' পরে সৈয়দ কাছে কাট অপ্রকাশ্য কথা শুনে বুঝেছিলাম। বড় কম মেজাজী ছিলেন না জহরলালজীর পিতাজী। আর অমৃতসরের কংগ্রেসের সময় কোনো পারিবারিক অশান্তিতে তাঁর মেজাজটা খুব বেশি বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল।

সে যাই হোক্‌, রবীন্দ্রনাথের এই উপাধিবর্জ্জন ব্যাপারটা সে-দিনের কংগ্রেসমহলে কি এ-দিনে গান্ধিজীর আসন্ন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও কোনোদিন বিশেষ কোনো সাড়া জাগায়নি। তাই দেখি, মহাত্মাজীর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে মৃদুলা সারাভাই, ডি জি তেণ্ডুলকার, চলাপতি রাও ও বিঠলভাই জাভেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "Gandhiji: His Life and Work" গ্রন্থখানির গান্ধি-জীবন-পঞ্জীতে (Gandhi Chronicle: 1867-1944) ছাপা হয়েছে—

1920 (Age 51)—

On August 1, Gandhi wrote to Viceroy surrendering Kaiser-i-Hind gold medal and Boer War medal. Rabindranath Tagore returned knighthood—Page 435.

অর্থাৎ কিনা গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ একই দিনে তাঁদের সরকারী শিরোপা পরিত্যাগ করেছিলেন—১৯২০-র ১লা আগস্ট!!

ইতিহাসের বিকৃতি এম্‌নি করেই ঘটে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের একখানি পত্র

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ম'শায়ের কাছ থেকে আমি সে-সময়ে যে একখানি পত্র পেয়েছিলাম তা' থেকে এই কথাটি স্পষ্ট হবে যে আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট'-উপাধিবর্জ্জন কোন সাড়া জাগাতে না পারলেও, বাঙালী কথাসাহিত্যিকশ্রেষ্ঠের অন্তরকে তা' নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। তিনি লিখেছিলেন—

বাজে শিবপুর—হাওড়া
১৬-৮-১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ভারতীর আড্ডায়* সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল ক'রে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হোলো।

* "ভারতীর আড্ডা" বসতো ২২নং সুকীয়া ষ্ট্রীট-বাড়ীর তিনতলার একটি বড় ঘরে। এখন সে-রাস্তার অর্দ্ধেকটার নাম হয়েছে কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। বাড়ীর নম্বরও গিয়েছে বদ্‌লিয়ে। তার একতলায় ছিল কান্তিক প্রেস। সে-ছাপাখানায় "ভারতী" ছাপা হোত। তখন সে-বিখ্যাত মাসিকপত্রিকার যুগল-সম্পাদক—স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁদের প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রতিদিন সেখানে জমায়েৎ হতেন তখনকার দিনের ছোটবড় বহু কবি ও শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। কখনো কখনো আসতেন রবীন্দ্রনাথও। হেমেন্দ্রকুমার তাঁর সুরম্য স্মৃতিকথা "যাঁদের দেখেছি" ও "যাঁদের দেখছি" দু'খানি বইয়ে "ভারতীর আড্ডা"'র কথা বিশদভাবে লিখেছেন।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

নারায়ণের সময়† সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।

তোমার কাগজের নামই‡ শুনেছি—কখনো চোখে দেখিনি। পাঠিও না দু'একখানা। তোমার এডিটর ত এখন জেলে।§ চালাও জোরসে। তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুসী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

† "নারায়ণ" মাসিকপত্র চিত্তরঞ্জন দাস-ম'শায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯১৪-সনে। ১৯১৫-সনের জুন মাসে তৎকালীন ভারতসম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'নাইট'-উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১৬তে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে ক'লকাতায় এসে বসবার পর চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তার পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয়।

‡ মহারাজ রণজিৎ সিংহের অন্যতম প্রধান সেনানী সর্দ্দার লেনা সিং ম্যজিথিয়ার পুত্র সর্দ্দার দয়াল সিং ম্যজিথিয়া যৌবনে শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তাঁর বহু সৎকার্য্যের মধ্যে লাহোর শহরে তিনি "ট্রিবিউন"-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮১ সনে। "ট্রিবিউন"-এর প্রথম সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সর্দ্দার দয়াল সিং-এর অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নির্ব্বাচন করে পাঠান। "ট্রিবিউন"-এর প্রথম ছাপাখানাও সুরেনবাবু কিনে পাঠান। তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। শীতলাকান্তের পর বিপিনচন্দ্র তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। পরে যশোরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল যদুনাথ মজুমদার-ম'শায়ও কিছুদিন "ট্রিবিউন" পরিচালনা করেন। তারপর দীর্ঘকাল "ট্রিবিউন"-এর সম্পাদক ছিলেন বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সবচেয়ে বেশিদিন "ট্রিবিউন" সম্পাদনা করেন কালীনাথ রায়—১৯১৫ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯৪৫ পর্য্যন্ত। ১৯১৯-এ তিনি যখন জেলে, তখন "ট্রিবিউন" সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হয়েছিল এই পুস্তকলেখকের উপর। পাকিস্তান হবার পর "ট্রিবিউন" প্রথমে লাহোর থেকে সিমলায়, তা'রপর সেখান থেকে জলন্ধরে যায়। এখন আম্বালা থেকে বের হচ্ছে।

§ "ট্রিবিউন" কাগজে একাধিক রাজদ্রোহমূলক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অপরাধে মার্শাল-ল' ট্রাইব্যুনালের বিচারে কালীনাথ রায়ের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বহু চেষ্টায় আটমাস পরে তিনি অব্যাহতি পান।

অমল হোম
১৬৯।বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।
দেশবন্ধু পার্ক। শ্যামবাজার।
॥ কলিকাতা ৪ ॥